জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ • সংখ্যা-২৮ • বর্ষ-৭

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ • সংখ্যা-২৮ • বর্ষ-৭

সম্পাদকীয়

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রাণেশ চন্দ্র বণিক
ফারমিনা হোসেন

সম্পাদক
ফেরদৌস সালাম

নির্বাহী সম্পাদক
বিদ্যুত খোশনবীশ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ইনফ্রা-রেড কমিউনিকেশনস লি.

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
শাহ আবুল কালাম আজাদ

প্রোডাকশন
মেসার্স অঞ্জলি.কম

যোগাযোগ
khoshnobish@burobd.org
01318 230552
01977 220550

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক
বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন (এফ),
সড়ক-১০৪, গুলশান-২,
ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা

দেশে চাই মানবিক উন্নয়ন

ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি শুরু থেকেই দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে। ব্র্যাক, আশা, বুরো বাংলাদেশ, এসডিএস, টিএমএসএসসহ এমএফআইসমূহ দরিদ্র মানুষের কাছে অনেকটা ব্যাংক। কারণ, এসব প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশ্বস্ততার সাথে অতিদ্রুত সঞ্চয় জমা, ঋণ উত্তোলন এবং রেমিটেন্সের অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। এতে করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত এসব মানুষের মধ্যে আর্থিক লেনদেন ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সম্যক ধারণা অর্জিত হয়েছে। এমএফআইসমূহের শাখাগুলোর কর্মীদের মধ্যেও দ্রুত সেবা প্রদানের কালচার লক্ষ্যণীয়। বিদেশ থেকে আসা রেমিটেন্সের অর্থ সংগ্রহের জন্য এখন আর শহরে ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে না, বরং সংশ্লিষ্ট এনজিও/এমএফআই এর কর্মীরাই উপকারভোগীদের ঘরে এসে প্রদান করছে প্রাপ্য অর্থ। এর ফলে হুন্ডির ব্যাপকতা কমে গেছে। বৈধ পথে বিদেশি মুদ্রা আসায় বাড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, লাভবান হচ্ছে দেশ। সরকারও বৈধভাবে রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের প্রণোদনা প্রদান করে উৎসাহিত করছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির ফলে শুধু নারীর ক্ষমতায়নই বৃদ্ধি পায়নি– অন্তর্ভুক্তিমূলক নানা কার্যক্রমও প্রসারিত হয়েছে। শীর্ষ পর্যায়ের এনজিওদের সাথে বিকাশ, উপায়, রকেট, শিওর ক্যাশসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অর্থ আদান-প্রদানে সম্পৃক্ত হওয়ায় সেবার মান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সৃষ্টি হচ্ছে ভিন্নমুখী ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা শ্রেণি। তাদের মাধ্যমে দেড় লাখ কোটি টাকারও বেশি অর্থ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক নানাবিধ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হওয়ায় শুধু আত্মকর্মসংস্থান নয় ব্যাপক কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হচ্ছে। ইতোমধ্যে ভয়াবহ করোনা সঙ্কট কাটিয়ে উঠে সাধারণ মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, বিআইডিএস প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং বিভিন্ন গবেষক যেমন স্টুয়ার্ট রাদারফোর্ড, ড. এস আর ওসমানী, ড. আতিউর রহমান, ড. সাজ্জাদ জহির, ড. বিনায়ক সেন, সিডিএফ, আইএনএম, ইনাফি, এফএনবিসহ বেশ কিছু নিরপেক্ষ গবেষণায় উঠে এসেছে যে, দেশের আর্থ-সামাজিক ও মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন। যেসব পরিবারে ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রকল্প আছে তাদের গড় আয় অন্যদের তুলনায় বেশি। তাদের জীবনযাত্রার মানও অপেক্ষাকৃত উন্নত। ফলে সার্বিক ক্ষেত্রেই এসব কর্মকাণ্ডের একটি বড় প্রভাব রয়েছে।

কিন্তু দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হলেই হবে না– মানুষের জীবনযাত্রার মানেরও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। কারণ, জনগণের ভালো থাকাটাই হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের মৌলিক সৌন্দর্য। যে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান যতো ভালো, দুশ্চিন্তামুক্ত সেই দেশ ততো বেশি উন্নত।

একসময় ভাবা হতো, পাঁচটি মৌলিক অধিকার– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষাই উন্নত মানব সমাজের দিক-নির্দেশনা। কিন্তু এখন তার পরিবর্তন ঘটেছে, এর সাথে আরো প্রয়োজন জনগণের নিরাপত্তা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ইত্যাদিও। দেশের এনজিও সেক্টর ক্ষুদ্র অর্থায়নের পাশাপাশি এসব ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে।

তবে উন্নয়নের সাথে সাথে দেশে ধনী-গরিবের বৈষম্যেরও বৃদ্ধি ঘটেছে– যা মানবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় বাধা। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে এ দেশে ধনীদের সংখ্যা বেড়েছে ১৭ শতাংশ যা যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপানসহ ৭৫টি উন্নত দেশের চেয়েও বেশি। এ সময়টিতে দেশের সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ পরিবারের আয় প্রায় ৫৭ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবারের আয় কমেছে ৫৯ শতাংশ এবং এই বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। অর্থাৎ দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও এ ধরনের আকাশ-পাতাল বৈষম্য উন্নয়নের সুফলকে বিঘ্নিত করে। এ জন্যই আমরা চাই উন্নয়ন হোক– তবে তা হোক মানবিক উন্নয়ন।

ভূটানসহ ক্যারিবিয়ান দেশসমূহ শুধু প্রবৃদ্ধি দিয়েই তাদের উন্নয়ন বিচার করে না, এক্ষেত্রে তারা দেশের মানুষ কতোটা সুখী, কতোটা নিরাপদ সে সব বিষয়গুলোকেও মূল্যায়ন করে থাকে। বাংলাদেশও প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণ কতোটা সুখী সেই মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে একটি মানবিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হোক এই প্রত্যাশা আমাদেরও।

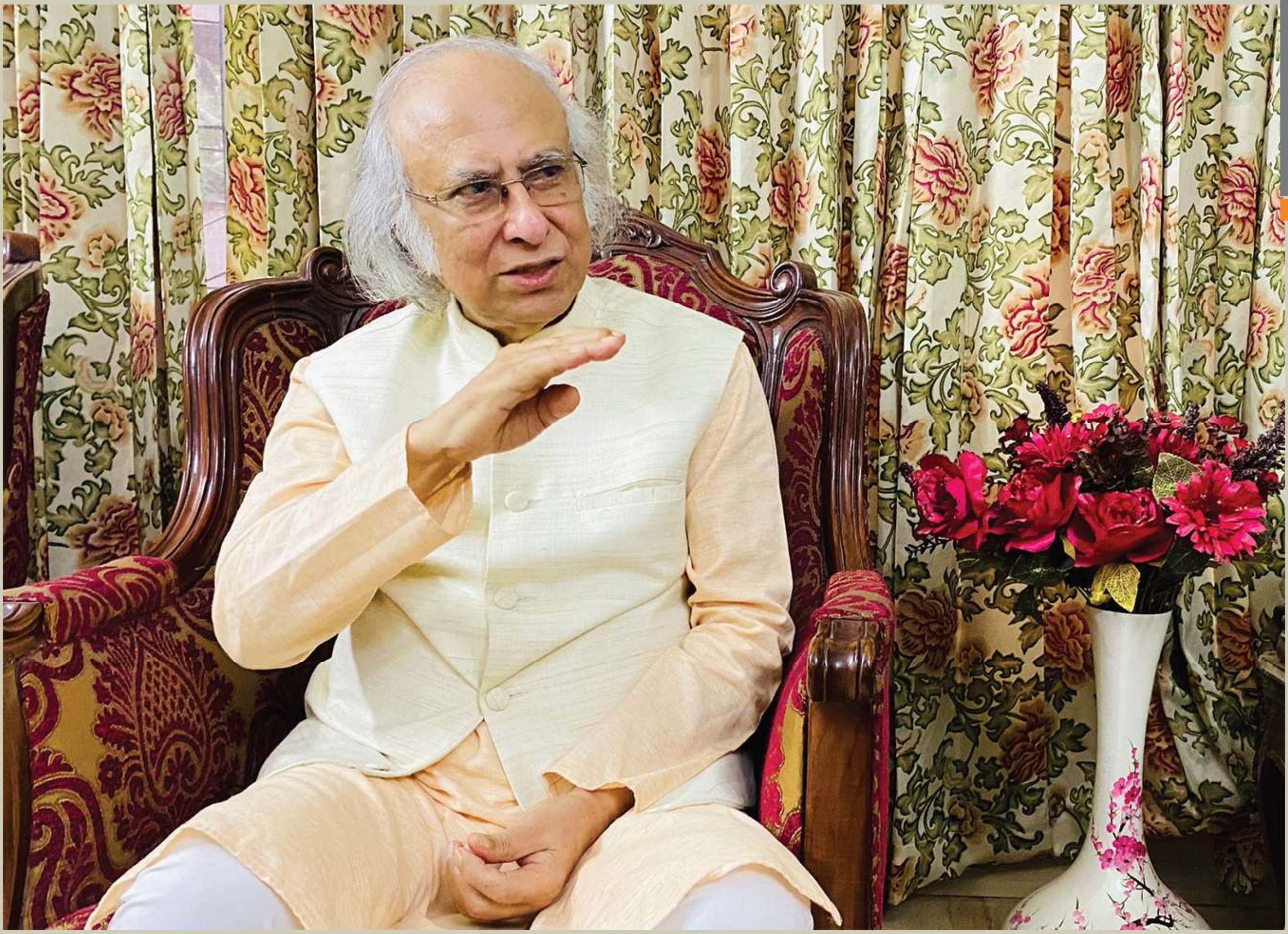

পিকেএসএফ মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ, সমাজচিন্তক এবং পরিবেশ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ১৯৪০-এর দশকের গোড়ার দিকে সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম মুমতাজুল মুহাদ্দিসিন মাওলানা মো. মুফাজ্জল হুসাইন ভারত বিভাগ পূর্ব সময়ে ১৯৪০ এর দশকে আসাম বিধান সভার নির্বাচিত বিধায়ক (এমএলএ) ছিলেন। পরবর্তীতে রাজনীতি ছেড়ে কলেজের অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ছোট বেলায় স্কুলে পড়েননি। তিনি সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত তার পিতার কাছে পাঠ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৩ সালে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬১ সালে ব্যাচেলর ডিগ্রি ও ১৯৬২ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি জাতীয় মেধা ফেলোশিপ লাভ করে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স ও পলিটিক্যাল সায়েন্সে (এলএমই-তে) অধ্যয়ন করেন এবং সেখান থেকে অর্থনীতি বিষয়ে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

এই অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মুজিবনগর সরকারের অধীনে পরিকল্পনা সেলে কর্মরত ছিলেন। দীর্ঘ প্রায় ছয় দশক ধরে তিনি গবেষণা, শিক্ষকতা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানব উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকসেরও গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং অনারারি ডিরেক্টর। একই সঙ্গে তিনি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর চেয়ারম্যান।

এছাড়া তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি এবং বিআইডিএস-এর সাবেক গবেষণা পরিচালক। তিনি ৪০টির বেশি বই রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। দেশে-বিদেশে তার প্রায় তিনশত গবেষণাভিত্তিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশই অর্থনীতি, পানি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন, মানবিকতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়া বিষয়ক।

তিনি ২০০৯ সালে দারিদ্র্য বিমোচনে অতি

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য একুশে পদক পান। ২০১৯ সালে জনসেবা ও সমাজসেবায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার' এবং একই বছর পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচারে অসামান্য অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকারের 'জাতীয় পরিবেশ পদক' পান। তিনি ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কনভেনশন ইউএনএফসিসি-এর আওতায় জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশের নেগোসিয়েশন দলের সমন্বয়ক হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। এক সঙ্গে তিনটি সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মাননায় ভূষিত মুক্তিযোদ্ধা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ একজন নিরহংকার মানুষ। তার স্ত্রী ড. জাহেদা আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। প্রত্যয়কে দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি যা বলেন তা উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয়: বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি– আমাদের অর্থনীতি কতোদূর এগিয়েছে এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের ভিত কতোটা মজবুত বলে আপনি মনে করেন?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: প্রথম কথা, মুক্তিযুদ্ধের পরপর যে অবস্থা ছিল তা হলো যুদ্ধের সময় দেশটাতে অনেক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে, অর্থনীতি খুবই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে, অনেক নতুন দরিদ্র মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাণের ভয়ে যে এক কোটি মানুষ ভারতে গিয়েছিল তারা ফিরে আসে নিঃস্ব অবস্থায়, অনেকেই ফিরে এসে দেখে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। এরা এবং দেশে থাকা বিধ্বস্ত অসংখ্য মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রয়োজন ছিল, কৃষি অর্থনীতিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, দেশের যাতায়াত ব্যবস্থা-রাস্তাঘাট-ব্রিজ-কালভার্ট ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, শিল্প প্রতিষ্ঠান খুব না থাকলেও যেগুলো ছিল সেগুলোতে পণ্য উৎপাদনও বন্ধ ছিল। এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেই কেউ কেউ আমাদের অর্থনীতিকে তলাবিহীন ঝুড়ি আখ্যায়িত করে, অবজ্ঞা করে। কেউ কেউ এও বলেছে ঐ অবস্থা থেকে যদি বাংলাদেশ উত্তরণ ঘটাতে পারে তবে পৃথিবীর পিছিয়ে থাকা সব দেশের পক্ষেই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

কিন্তু তাদের মধ্যে এই উপলব্ধি আসেনি যে, আমাদের মহান নেতা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা-পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেছিলেন: 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।' বাঙালি জাতির ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করেই তিনি এটি বলেছিলেন। তিনি দেখেছেন বারবার বাঙালি সমস্যার সম্মুখীন হয় কিন্তু ঘুরে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সেই অবস্থা থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু দেশকে এগিয়ে নেয়ার একটা অর্থনৈতিক ভিত তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যার পর এই অর্থনীতি ভিন্ন স্রোতে চলে যায়। বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ছেদ পড়ে। আস্তে আস্তে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পুঁজিবাদের দিকে যায়। এখানে সামরিক শাসনের সময়ে আশির দশকে দেশ উঁচু মাত্রার বিদেশি সাহায্য নির্ভর হয়ে যায়। বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের পুরোটাই ঐ দশকে বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হতো।

তারপর ১৯৯০ সালের পর আমরা যখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরে এলাম তখনো সরকারের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই মুক্তিযুদ্ধ চেতনার মূল ধারায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে অন্তরায় ছিল– অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যে ধারার প্রবর্তন করা হয় সেই ধারাই চলছিল। পুঁজিবাদের প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টা জোরদার করা হচ্ছিল কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেভাবে ত্বরান্বিত হয়নি। এর কারণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এলেও নীতির পরিবর্তন ঘটেনি। তবে ১৯৯৬ বা ১৯৯৭ সালে শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয়, যা হলো কৃষিতে ভর্তুকি দেয়া। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এবং দ্বিপাক্ষিকভাবে যে সকল দেশ বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছিল তারা সবাই এর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া তা না মেনে কৃষিখাতে উল্লেখযোগ্য ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এটি দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে; বিশেষ করে, খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে যায় ২০০০ সাল নাগাদ। ২০০১ সালের নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের পর ভর্তুকি বহাল থাকলেও কৃষি উন্নয়নে সরকারের আগ্রহ কমে যায়। দেখা যায়, সার্বিকভাবে প্রবৃদ্ধির হারও তেমন বাড়েনি। ১৯৮০'র দশকে জাতীয় উৎপাদে (জিডিপিতে) গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৩ দশমিক ৪ শতাংশ, ১৯৯০-এর দশকে তা গড়ে ৫ শতাংশের মত ছিল। ২০০০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত তা ছিল গড়ে বছরে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ। কোনো কোনো বছর ৬ শতাংশ বা কিছু বেশি হয়েছে, তবে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয়নি। অর্থাৎ উন্নতি যে একেবারেই হয়নি তা নয়। তবে উন্নতি ধারাবাহিক হয়নি, দ্রুততর হয়নি। ২০১০ এর পর জাতীয় উৎপাদে প্রবৃদ্ধির হারে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয়। প্রথম পাঁচ বছর গড়ে ৬ শতাংশে উপর ছিল, পরবর্তী তিন বছর ছিল গড়ে ৭ শতাংশের উপর এবং ২০১৮-১৯ সালে ৮ দশমিক ১৫ শতাংশে উন্নীত হয়। এই সময়ে গ্রামীণ খাতে বিশেষ জোর দেয়া হয়, কৃষি এবং অকৃষি উভয় ক্ষেত্রেই।

কৃষিতে সাফল্য লাভের ফলেই করোনা মহামারির সময়ও বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য সংকটে পড়েনি। তাছাড়া পৃথিবীর যে কয়েকটি দেশ করোনাকালে জাতীয় উৎপাদে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০১৯-২০ সালে ৩ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ২০২০-২১ সালে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। আমি মনে করি আমাদের অর্থনৈতিক ভিতটা হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি– কৃষি এবং বিভিন্ন অকৃষি খাত। তবে আগে অনেকেই এটা স্বীকার করতেন না। তারা বলতেন শিল্প ও রপ্তানি খাতই আমাদের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি সবসময়েই বলেছি কৃষি ও গ্রামীণ অকৃষি খাতের ওপরই এখনও এদেশের অর্থনীতি মূলত দাঁড়িয়ে রয়েছে। অবশ্যই অন্যান্য সব খাতের অবদান রয়েছে, দেশের দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সামাজিক সূচকেও দেশে বেশ উন্নয়ন ঘটেছে। বাংলাদেশে গড় আয়ু বেড়ে ৭৩ হয়েছে। স্বাধীনতার সময় তা ছিল ৪৬ বছর। শিক্ষার হার বেড়ে ৭৬ শতাংশ হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন বেড়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছি। তবে নারীর যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের আরো অনেকদূর যেতে হবে। স্বাস্থ্য খাতেও এগিয়েছি। কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে এখনও অনেক ঘাটতি আছে। শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি অনেক এগিয়েছে, কিন্তু শিক্ষার মান সব পর্যায়েই প্রশ্নবিদ্ধ থেকে গেছে।

প্রত্যয়: আপনি সরকারের পল্লী কর্মসংস্থান ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর চেয়ারম্যান। ১৯৯০ সালে দেশের স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে দারিদ্র্য নিরসনে আপনাদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন। এর সংঘস্মারকে অনেক বিস্তৃত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। শুরুতে এটিকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণের কথা সংঘস্মারকে লেখাই নেই। তবে কেনো পিকেএসএফকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানো হলো? আমার ধারণা এর মূল কারণ এই যে, ঐ সময় দেশে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে খুব উৎসাহ ছিল। তখন ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী গ্রামীণ ব্যাংক সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যাপকভাবে ধারণা করা হচ্ছিল যে, ক্ষুদ্রঋণ দ্বারা দারিদ্র্য নিরসন করা যাবে। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনায় তখন যারা ছিলেন তারাও সেই ধারণায় বিশ্বাস করলেন। তাই পিকেএসএফও ক্ষুদ্রঋণ দেয়ার জন্য সহযোগী সংস্থাদেরকে অর্থায়ন করতে লাগলো।

আমি পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিতে চাইনি কারণ আমার বিবেচনা ও গবেষণা থেকে আমার এই ধারণা হয় যে, ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখতে পারে সামান্যই, আর টেকসই দারিদ্র্য নিরসনে তো নয়ই। আমাকে বলা হলো পিকেএসএফ-এ পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হলে তা করতে পারবো।

আমি সংঘস্মারক দেখলাম: তাতে স্বাস্থ্য, জীবন মানের উন্নয়ন এবং শিক্ষার কথা আছে, ঋণের কথা আছে, কিন্তু ক্ষুদ্রঋণের কথা নেই। কাজেই আমি যে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলাম,

সংঘস্মারকেই তার সমর্থন, এমনকি দিকনির্দেশনা রয়েছে। এসব বিষয় পর্যালোচনা করে আমি একে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের দিকে নেয়ার পদক্ষেপ নিতে শুরু করলাম। পিকেএসএফ-এ কর্মরত সকলে, বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে জোরদার কাজ শুরু করেন। সহযোগী সংস্থাসমূহ এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়।

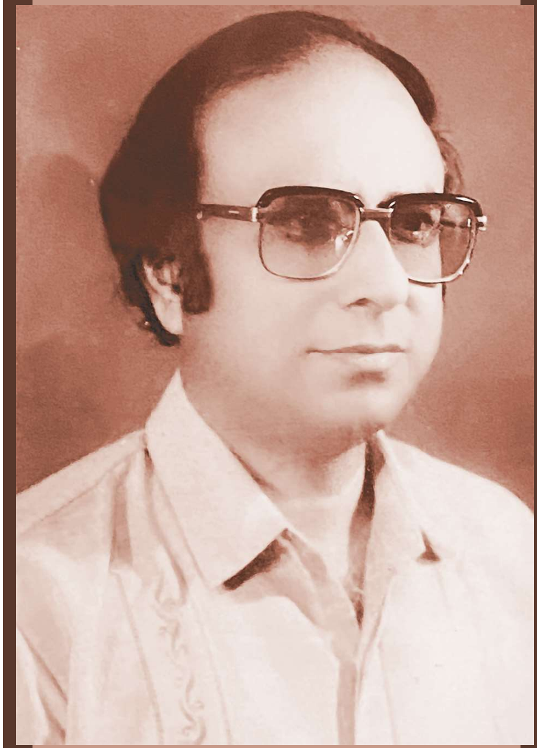

মানুষের জীবন বহুমাত্রিক, মানুষকে বিবেচনায় নিলে সকল কার্যক্রমে বহুমাত্রিকতা সামনে চলে আসে। আমরা একটি মানবকেন্দ্রিক বহুমাত্রিক সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছি, সংক্ষেপে এর নাম 'সমৃদ্ধি'। এটি হলো দরিদ্র পরিবারসমূহের সক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই কার্যক্রম ইউনিয়ন-ভিত্তিক বাস্তবায়ন করা হয়। একটি ইউনিয়নে কার্যক্রম শুরু করার আগে পুরো ইউনিয়নের সকল পরিবার জরিপ করা হয়, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার জন্য এবং সার্বিক সহযোগিতা যে সকল পরিবারের প্রয়োজন তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য। দেখা গেছে সাধারণত ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ পরিবার এই গোষ্ঠীভুক্ত। এরকম প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয় সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের মতামতকে প্রধান্য দিয়ে। এ সকল পরিবারকে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অ-আর্থিক সব সেবা প্রদান করা হয়। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা ধনী-গরিব সব পরিবারের জন্য উন্মুক্ত। অন্যান্য সেবার মধ্যে রয়েছে- কৃষিঋণ, উদ্যোক্তা ঋণ, যুব উন্নয়ন, মূল্যবোধ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, ঘর-মেরামত ও সম্পদ আহরণ ঋণ ইত্যাদি। মোট ২৯ টা সেবা রয়েছে যেগুলোর মধ্যে যার যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো তাকে দেয়া হয়।

এই কর্মসূচিতে জীবনচক্রের বিভিন্ন বিশেষ পর্যায়ের জন্য উপযুক্ত কার্যক্রম রয়েছে: গর্ভবতী মা, নবজাতক, কিশোর-কিশোরী, উন্নয়নে যুব সমাজ, পূর্ণ-বয়স্ক এবং প্রবীণ। সব বয়সের মানুষের মধ্যে সামাজিকতা বৃদ্ধিকল্পে বছরে অন্তত: একদিন সব বয়সের মানুষদেরকে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একত্রে আনার চেষ্টা করা হয়।

এই কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে তাদের চাহিদামাফিক সহায়তা দেয়া হয়। যারা অতিদরিদ্র তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হয় তা স্বাভাবিকভাবে প্রথমে কম হবে। তারা দরিদ্র পর্যায়ে উঠে আসে এবং তাদের পাশে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিয়ে সমৃদ্ধি দাঁড়ায়। তারপর তারা অদরিদ্র হয় এবং শেষে তারা স্বাবলম্বী হয়। প্রত্যেক পর্যায়ে উপযুক্ত ঋণ এবং অন্যান্য সহায়তা তাদেরকে দেয়া হয়। সবশেষে যারা উদ্যোক্তা হতে চায় সেই আঙ্গিকে তাদেরকে সহায়তা দেয়া হয়। অবশ্য প্রাথমিক অবস্থায়ই যে কোনো পর্যায়ে থাকা পরিবারকে (যেমন দরিদ্র বা অদরিদ্র কিন্তু ঝুঁকিতে থাকা) তাদের প্রয়োজনীয় সেবা দিয়ে পিকেএসএফ তাদের পাশে দাঁড়ায়। তারা এগিয়ে যায়, পিকেএসএফ তাদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রত্যেক ধাপে দিয়ে তাদের পাশে থাকে যতক্ষণ না তারা টেকসই উন্নয়ন পর্যায়ে উন্নীত হয়।

প্রথমে আমরা শুরু করেছিলাম অল্প কয়েকটা ইউনিয়নে, এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২০২টা ইউনিয়নে সমৃদ্ধি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সব ইউনিয়নে প্রায় ৬ মিলিয়ন মানুষ সমৃদ্ধির আওতায় সহায়তা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দরিদ্ররা দ্রুত দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আরেকটা কথা বলি। আগে ১০/২০ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হতো। কিন্তু একজনের হয়তো বেশি অর্থের প্রয়োজন তার পরিকল্পিত কাজটি করার জন্য। তখন তিনি অন্য ২/৩টা উৎস থেকেও ঋণ নিতেন। অথবা ঋণ নিয়ে তা অন্য কাজে খরচ করে ফেলতেন। অনেক সময় দেখা যেতো তিনি টাকা দিয়ে কিছু করতে পারেননি। কিন্তু টাকা খরচ হয়ে গেছে। ফলে দেনার দায়ে তিনি বিধ্বস্ত হয়ে পড়তেন। এখন পরিকল্পিত কাজ ঠিকমত বাস্তবায়ন করার জন্য যত টাকা প্রয়োজন সেই পরিমাণ ঋণ দেয়া হয়, তবে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা। কাজেই উপর্যুক্ত সমস্যা আর নেই।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, আর তা হলো উদ্যোক্তা তৈরি, অবশ্য তা মাইক্রো পর্যায়ে। টেকসই দারিদ্র্য নিরসন নিশ্চিতকরণের পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। ইতোমধ্যে পিকেএসএফ দেশে ২১ লাখ টেকসই পর্যারের নতুন মাইক্রো উদ্যোক্তা তৈরি বা প্রতিষ্ঠিত মাইক্রো উদ্যোক্তাকে এগিয়ে চলার জন্য সহায়তা দিতে সক্ষম হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে পরিবেশের উত্তরণ উভয় ক্ষেত্রেই পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি রয়েছে। এজন্য একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে আলাদা একটি ডিভিশন সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদেরকে যার যা প্রয়োজন হয় সবই জোগান দেয়ার চেষ্টা করা হয়। ফলে এক সময় যেটি ছিল ক্ষুদ্রঋণের প্রতিষ্ঠান এখন তা মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটি বিশেষ দিক।

প্রত্যয়: স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত ছিল, করোনা মহামারির কারণেও আমরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। এই সঙ্কট মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি কেমন ছিল?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: আসলে এই মহামারির বিষয়ে শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের কোনো দেশেরই তেমন ধারণা ছিল না, কাজেই এর মোকাবিলা করার প্রস্তুতি কোনো দেশেরই ছিল না। যদিও সার্স ও মার্স প্রাদুর্ভাবের পরে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করেছিলেন বড় আকারের ভাইরাস-সৃষ্ট মহামারি আসতে পারে। ধারণা ও প্রস্তুতি না থাকায় শুরুতেই সবদেশেই এলোমেলো অবস্থা ছিল। তবে বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে দ্রুত তৎপর হয়। অর্থনীতিকে সচল রাখতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রথম দিকেই প্রণোদনা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়। ২০২০ সালের মার্চের ৮ তারিখ করোনা শনাক্তের পর এপ্রিলের ১৩ তারিখ ক্ষতিগ্রস্ত সব খাতের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এটি সরকারের দুঃসময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সদিচ্ছার পরিচায়ক। যদিও এর বাস্তবায়ন করতে কিছুটা সময় লেগেছে। তবে একটি গোষ্ঠী সামান্য সহায়তা বা প্রণোদনা পেয়েছে– কুটির ও অতিক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা যেগুলো মূলত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রায় এক কোটি এবং আড়াই থেকে তিন কোটি মানুষ এগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রণোদনা ব্যাংকের মাধ্যমে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু ব্যাংকের কাছে এরা পৌঁছতে পারে না এবং ব্যাংকও এদের কাছে যায় না। পরে তিনবারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ হাজার কোটি টাকা পিকেএসএফসহ যে সকল প্রতিষ্ঠান সেই পর্যায়ে কাজ করে তাদের মাধ্যমে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এ কাজটি করা তাঁর দূরদর্শিতার একটি পরিচায়ক। কিন্তু তা পর্যাপ্ত ছিল না, তবুও অনেকে প্রণোদনা পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, করোনার প্রথম ধাপে অনেক মানুষ কাজ হারান, আয়ের উৎস হারান। অসংখ্য প্রান্তিক মানুষেরা জীবিকার সংকটে পড়েন। তবে এই সংকট কয়েকটি কারণে আরো তীব্র হয়নি। প্রথমত সরকার অনেককে খাদ্য বা নগদ সহায়তা দেয়। এছাড়াও এই বিপর্যয়ের সময়ে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন দাঁড়িয়েছে। তৃতীয়ত দেশে জাতীয় পর্যায়ে

খাদ্য সংকট ছিল না। এভাবে সরকার এবং মানুষের সহযোগিতায় বিপদগ্রস্তদের সমস্যার সমাধান হয়েছে। সাধারণ মানুষ এগিয়ে না এলে সরকারের একার পক্ষে এই সংকট মোকাবিলা করা হয়ত সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশে অতীতেও দেখা গেছে, দুর্যোগকালে অনেকেই বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়।

প্রত্যয়: সরকার ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ীসহ ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসায়ীদের যারা এনজিও/এমএফআই থেকে স্বল্প ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছেন সবার জন্যই প্রণোদনা দিয়েছেন। আপনার পর্যবেক্ষণ কি?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: একটি কথা স্বীকার করতেই হবে– যাদের আছে, তারাই বেশি প্রণোদনা পেয়েছে। ২০২০ সালের ১৩ এপ্রিল ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে ২০ হাজার কোটি টাকা ছিল অতিক্ষুদ্র (মাইক্রো), ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য। পরবর্তীতে এর মধ্যে ১৪ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্রদের জন্য এবং ৬ হাজার কোটি টাকা মাঝারিদের জন্য। কিন্তু কুটির ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে এই প্রণোদনা পৌঁছেনি। কেননা ব্যাংকের মাধ্যমে এই প্রণোদনা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু সাধারণত ব্যাংকের সাথে তাদের যোগাযোগ নেই। আগেই বলেছি এ পর্যায়ের উদ্যোক্তা-সংখ্যা প্রায় ১ কোটি, প্রধানত গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং তাদের জন্য পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী প্রথমে ২০০০ কোটি টাকা এবং পরে ২ দফায় আরো ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেন এবং এই প্রণোদনা লক্ষ্যভুক্তদের কাছে যেন পৌঁছে সেরকম ব্যবস্থা করা হয়।

প্রত্যয়: করোনার আগে বলা হতো ২১ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে। কিন্তু অনেকেই বলছেন এখন তা বেড়ে ৩০ শতাংশের ওপরে হয়ে গেছে, আপনার অভিমত কি?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: কতো শতাংশ বেড়েছে তা বলতে পারব না, তবে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দুটোই বেড়েছে। এটি কিন্তু শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বেই বেড়েছে।

প্রত্যয়: দারিদ্র্য ও বৈষম্য যাতে না বাড়ে সে জন্য সরকারের কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন? আপনি বলেছেন খাদ্য সংকট না থাকায় আমরা করোনাকালের সংকট থেকে উদ্ধার পেয়েছি–

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: এটা ঠিক যে করোনা মহামারি বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের কৃষিখাত কতো গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, কৃষিখাতে শষ্য ও শাক-সবজি, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ ও বনায়ন অন্তর্ভুক্ত। সরকার অবশ্য কৃষিখাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভর্তুকি এবং ঋণ দিচ্ছে, যান্ত্রিকীকরণে সহায়তা দিচ্ছে। তা অব্যাহত রাখতে হবে।

অন্যদিকে গ্রামীণ অকৃষি বিভিন্ন খাতে (ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি) উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে কৃষি ভালো করেছে, এবারও করেছে। প্রকৃতিও সাধারণত অনুকূলে ছিল। দেশব্যাপী বড় ধরণের প্রাকৃতিক তেমন দুর্যোগে ঘটেনি। তবে প্রায় প্রতিবছরই দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি করে বন্যা, ফ্লাস বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, নদীভাঙ্গন এবং উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস।

এসবই দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রাখছে, বৈষম্য বাড়ার প্রবণতাকে কিছুটা হলেও রাশ টেনে ধরে। তবে দেশে বিরাজমান বৈষম্য প্রকট। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে থাকাদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ জোর দিতে হবে; যাতে তারা নিজেদের অগ্রগতির জন্য আরো কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে। মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারণা সামনে রেখে পিছিয়ে থাকা বিভিন্ন গোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ "দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে হবে" বঙ্গবন্ধুর এই উন্নয়ন দর্শন অনুসরণ করলে দেশে সুষম উন্নয়ন সম্ভব হবে।

প্রত্যয়: একটি বিষয় নিয়ে বেশ আলোচনা হয় যে, পিকেএসএফ কম সুদে এনজিওদের টাকা দিলেও তারা গ্রাহকদের কাছ থেকে অনেক বেশি সুদ নেয়– আপনার বিশ্লেষণ কি?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: সরকারের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এনজিও/এমএফআইদের জন্য সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করে দেয়। বর্তমানে তা ২৪ শতাংশ। এমআরএ এই রেইট নির্ধারণ করার সময় হিসেব করে দেখে যে, ঋণ দেয়া, সেগুলো আদায় করা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা কাজ-কর্ম সম্পাদন করতে অর্থসংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় ২১ শতাংশের মত খরচ হয়ে যায়। মার্জিন ৩ শতাংশ রেখে সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করা হয় ২৪ শতাংশ। তবে আমরা পিকেএসএফ থেকে যে উদ্যোক্তা ঋণ দিই, তাতে মাঠ পর্যায়ে সার্ভিস চার্জের হার ১৮ শতাংশ। আর সম্পদ সংগ্রহ ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য যে ঋণ দেয়া হয় তাতে সার্ভিস চার্জের হার ৮ শতাংশ।

প্রত্যয়: আপনি একজন প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ। লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির হার বাড়লেও সাধারণ মানুষের জীবনমানের ততোটা উন্নয়ন হচ্ছে না– এর কারণ কি?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: দেখুন অর্থনীতিবিদদের অনেকের বক্তব্য হচ্ছে জাতীয় উৎপাদে প্রবৃদ্ধি বাড়লে উন্নয়ন হবে। বিনিয়োগের কথা বলা হয় কিন্তু কোথায় বিনিয়োগ হচ্ছে সে প্রশ্ন উহ্য থাকে। ধারণা করা যায়, তারা সাধারণত আনুষ্ঠানিক খাতসমূহে বিনিয়োগের কথা বলেন। আসলে উৎপাদের প্রবৃদ্ধিই উন্নয়ন নয়, আর গড় আয় যা বলে তার চেয়ে বেশি লুকিয়ে রাখে। আসল চিত্র দেখতে হলে আয়ের বিভাজন অর্থাৎ আয় বৈষম্য দেখতে হয়। তবে আয়েই নয়, বৈষম্য নানা ধরণের হয়: শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সুপেয় পানির প্রাপ্যতা, বিদ্যুৎ প্রাপ্তি, চলাফেরার সুযোগ ইত্যাদি। এসব বিবেচনায় নিলেই আসল চিত্র বোঝা যায়। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার পিছিয়েপড়া মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে তাদের সামনে সে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো দূর করা জরুরি।

প্রত্যয়: দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপনারা উচ্চকিত, সরকার প্রধানও সোচ্চার। বলছেন জিরো টলারেন্সের কথা। কিন্তু দেশে দুর্নীতি বেড়েই চলেছে– আপনার বিশ্লেষণ কি?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দেশে দুর্নীতি ব্যাপক এবং বাড়ছে। তবে তা কতোটা সে বিশ্লেষণে আমি যাব না, শুধু বলব তা প্রকট। আমরা মূলত দুটি চক্রে ঘুর-পাক খাচ্ছি। একটা দুর্নীতি, অন্যটা বৈষম্য। দুর্নীতি এতটাই বিস্তৃত যে এর বাইরে থেকে অনেক কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। এটা নিচ-উপর বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। নদী রক্ষা কমিশনের এক প্রতিবেদনেও এই চিত্র উঠে এসেছে। কমিশন ৫০ হাজার নদী দখলদারের তালিকা প্রকাশ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৯ গ্রহণ করছেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

ব্যাংক পরিচালনার সাথে যারা যুক্ত, তাদের অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত। আবার যারা ঋণ নেন, সেই উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীদের অনেকে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এভাবে দুই পক্ষের যোগসাজশেই ব্যাংকের অর্থ লুটপাট হচ্ছে। আবার যারা ঋণ নেন, তাদের কেউ কেউ খুব প্রভাবশালী, তাদের কথা না শুনলে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার চাকরি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কোনো কোনো ব্যাংকের মালিকপক্ষ নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত, যারা নিজেদের ব্যাংকের টাকাও সরিয়ে ফেলেন। এজন্য মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং 'আমিত্ব' অনেক দায়ী।

এই আমিত্ব বাদ দিয়ে আমাদের 'আমরা' হতে হবে। তা হলে কেউ কারো ক্ষতি করবে না। সবাই যে যার কাজ করবে এবং নিজের চেষ্টায় এগিয়ে যাবে কিন্তু অন্য কাউকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নয়। এটাই মানবিক সমাজের দাবি। সবাই ন্যায়-নীতির পথে থাকলে তবে সোনার বাংলা গড়ার পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, আইনের শাসনে ঘাটতি দূর করতে হবে।

এগিয়ে চলার পথে কিছু সমস্যা থাকে বা নতুনভাবে সৃষ্টি হয়। এখন যে সমস্যাগুলো আছে তা চিহ্নিত করা আছে, বর্তমান সরকারি দল আওয়ামী লীগের ২০০৮ এর নির্বাচনি ইশতেহারে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়: এদেশে অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র তৈরি করা হবে। উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক উন্নতি অর্জিত হয়েছে। এই অর্জনকে সুসংহত ও ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে যে সকল চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে চিহ্নিত করা আছে: এগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈষম্য বাস্তবায়নে দুর্নীতি এবং অনিয়ম, আইনের শাসনের ঘাটতি, বিচারিক ঘাটতি, তরুণ শক্তিকে ব্যবহারে ঘাটতি, গ্রাম পিছিয়ে আছে, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে স্বল্প অগ্রগতি, ব্যাংকিং খাতে সমস্যা ইত্যাদি চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার কথা বলা হয়েছে। সেগুলো দূর করে মানবিক সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করার পথে এগিয়ে চলা সম্ভব হবে। ১৯৭১-এর ৭ মার্চ-এর বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উচ্চারিত স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, কিন্তু মুক্তির সংগ্রাম এখনো অব্যাহত। এ মুক্তির পথে দৃপ্ত পদে এগিয়ে যেতে হলে আমাদের সবাইকে আমিত্ব থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। 'আমরায়' পরিণত হতে হবে। মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধে দীক্ষিত হতে হবে।

প্রত্যয়: আপনি বঙ্গবন্ধুর স্বনির্ভর সোনার বাংলার প্রতি জোর দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি–

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: সোনার বাংলার অর্থটা বুঝতে হবে। সোনার বাংলা অর্থ হচ্ছে, যেখানে বৈষম্য থাকবে না, প্রত্যেকেই সকল মানবাধিকার ভোগ করবে এবং মানব মর্যাদায় বসবাস করবে। প্রত্যেকেই মন্ত্রী হবে না, শিক্ষক হবে না, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হবে না বা শিল্পপতি হবে না, কিন্তু যিনি যে কাজই করুন তিনি মানুষ হিসেবে মর্যাদা পাবেন, সম্মান পাবেন। আমাদের সংবিধানে বলা আছে যে, সবাই এই প্রজাতন্ত্রের সমনাগরিক, সম-মালিক। নাগরিক ও মানুষ হিসেবে আমরা সবাই সমান। কাজ ও দক্ষতার ভিন্নতা থাকবে কিন্তু মানুষ হিসেবে সমমর্যাদার অধিকারী হবে সবাই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও তাই। বাস্তবতা এরকম হলেই এই দেশ হবে সোনার বাংলা। সোনার বাংলায় সরকার এবং ব্যক্তি উদ্যোগ সবই হবে মানুষের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে।

বঙ্গবন্ধু যে মুক্তির সংগ্রামের কথা বলেছিলেন সে সম্বন্ধে আগেই বলেছি। তিনি বলেন "দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে"। এই কথাটি খুব সাধারণ মনে হলেও এর মধ্যে একটি গভীর দর্শন রয়েছে। যারা দরিদ্র এবং পিছিয়ে আছেন বা পড়েছেন তাদের প্রতি বেশি নজর দিতে হবে। ধনী বা ক্ষমতাবানদের দিকে নজর দেয়ার দরকার নেই। কারণ, তারা নিজেরা নিজেদেরটা করতে পারে, এমনকি অন্যেরটাও নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যারা বঞ্চিত দরিদ্র, অবহেলিত, যাদের পিছিয়ে রাখা হয়েছে– তাদের দিকে নজর দিতে হবে। এ জন্য সোনার মানুষ গড়তে হবে। কিন্তু মূল্যবোধের অবক্ষয়ই ব্যাপক বাস্তবতা। বাংলাদেশে এই অবস্থার অবসান জরুরি।

প্রত্যয়: একটা সময় ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতে সুদের হার অনেক বেশি ছিল। এখন তা কমিয়ে এনে ২৪% করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাংকগুলো কম সুদে ঋণ দিয়ে থাকে। আপনার মূল্যায়ন কি?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: না, ব্যাংকের সাথে মাইক্রোফাইন্যান্সকে তুলনা করার সুযোগ নেই। ব্যাংক তো টাকা দিয়েই খালাস। এ ছাড়া ব্যাংক ক্ষুদ্র আকারে অনেক মানুষকে টাকা দেয় না। তারা উদ্যোক্তা-ভিত্তিক বড় অংকের টাকা দেয়। এতে তাদের পরিচালন ব্যয় অনেক কম হয়। অর্থাৎ ব্যাংক যেভাবে টাকা দেয় তাতে তাদের বিতরণ ব্যয় এমএফআই-র তুলনায় অনেক কম। ব্যাংক এক ব্যক্তিকে অনেক টাকা দিচ্ছে আবার সেই টাকা আদায়ে তাদের বাড়ি বাড়ি যেতে হচ্ছে না। কিন্তু এনজিও/এমএফআইদের ঋণের প্রক্রিয়ায় ব্যয় অনেক বেশি। তাদের বাড়িতে বাড়িতে, ঘরে ঘরে যেতে হয়। আমি আগেই বলেছি এভাবে কয়েক বছর আগে হিসেব করে এমআরএ দেখেছিল যে, এনজিও বা এমএফআইদের অর্থ সংগ্রহ ও বিতরণ-আদায় ব্যয় ২১ শতাংশে দাঁড়ায় এবং সে দিকটি বিবেচনা করেই তাদের প্রদত্ত ঋণের সার্ভিস চার্জ ২৪ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। এখন অবশ্য অনেক এনজিওরই নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি পেয়েছে– কারো ৫০ শতাংশ, আবার কারো বা ৬০ শতাংশ সঞ্চয় হয়ে গেছে। ফলে সংশ্লিষ্ট এনজিওদের অর্থ সংগ্রহ ও ঋণ প্রদান ও আদায়ে পরিচালন ব্যয় অনেক কমে আসতে পারে। পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে যে ঋণ দেয়া হয় সেখানে ক্ষেত্র বিশেষ তাদেরকে ১৮ শতাংশ বা ৮ শতাংশ সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হয়- একথা আগে আলোচনা করেছি। কম সার্ভিস চার্জ আদায় করার জন্য প্রয়োজনে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাদেরকে কিছু প্রণোদনা দিয়ে থাকে, যাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

এক সময় গুরুত্ব দেয়া হতো ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটা টেকসইভাবে ভালো চলতে হবে তার উপর। এখন জোর দেয়া হয় যারা এমএফআই থেকে ঋণ এবং বিভিন্ন অ-আর্থিক সেবা নেন তারা ভাল আছেন কিনা, এগিয়ে যাচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে। এটাই হওয়া উচিত একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণকারী দেশে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনে যোগ দিয়ে পরিচালনা পর্ষদের প্রথম মিটিংয়ে আমি একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম। প্রস্তাব আসলো একটি প্রতিষ্ঠানকে এতো টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল, তা প্রতিষ্ঠানটি বিতরণ করেছে এবং শতভাগ আদায় করাও হয়েছে। কাজেই এই প্রতিষ্ঠানকে আরো এত টাকা দেয়া যায়। আমার প্রশ্ন ছিল: যে ব্যক্তি ঋণটা নিলেন তার কি উত্তরণ ঘটেছে। আসলে যারা ঋণ নেয় তাদের উপকার হতে হবে, আবার প্রতিষ্ঠানকেও ভালো চলতে হবে। এই দুটোর সমন্বয় সাধন করেই এগুতে হবে।

প্রত্যয়: বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়নের সার্ভিস চার্জ অনেক বেশি বলে অনেকেই মনে করেন? আপনারা পিকেএসএফ থেকেও এনজিওদের ঋণ দেন। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য জানতে চাচ্ছি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত এমএফআইগুলোর অধিকাংশেরই শুরু ১৯৯০ এর দশকে। কিছু কিছু ২০০০ সালের পরও গড়ে তোলা হয়েছে। ঐ সময় বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করে। তবে অনেক ক্ষেত্রে এটা একটা ব্যবসা হয়ে যায়। আর তখন সার্ভিস চার্জ বা সুদ ফ্লাট রেইটে হিসেবে ১২-১৫ শতাংশ ছিল। যেদিন ঋণ দেয়া হতো সেদিনই সম্পূর্ণ ঋণের উপর সার্ভিস চার্জ সারা বছরের জন্য হিসেব করে নেয়া হতো এবং তা সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মূলধনের সঙ্গে আদায় করা হতো। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা যে কিস্তি পরিশোধ করেন তাতে আসলও ফেরত দেয়া হয়, তাই তার কাছে থাকা ঋণের পরিমাণ কমে আসে– এটি বিবেচনায় নেয়া হতো না। বস্তুত গড়ে বছর ধরে গ্রহীতার কাছে গৃহীত ঋণের অর্দ্ধেকের মত থাকে। কাজেই আদায়কৃত যে ফ্লাট হার নির্ধারণ করা হতো আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ তার দ্বিগুণ হয়ে যেতো। অর্থাৎ ১৫ শতাংশ হয়ে যেতো ৩০ শতাংশে। তাছাড়া ৫ শতাংশ ঋণ প্রদান মুহূর্তেই কেটে রাখা হতো বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসেবে। এই সঞ্চয়ের উপর ৩ থেকে ৫ শতাংশ হারে সুদ দেয়া হতো। এমএফআই এই অর্থ ব্যাংকে রাখলেও ১২-১৪ শতাংশ সুদ পেতো। আর মাঠ পর্যায়ে ঐ টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করলে তা ন্যূনপক্ষে ৩০ শতাংশ পেতো। কাজেই গরীব ঋণগ্রহীতাদের উল্লেখযোগ্যভাবে ঠকানো হতো। এখন সেই অবস্থা নেই। ২৪ শতাংশ ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি আদায় করা হয় এবং বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসেবে কোনো টাকা কাটা হয় না। অবশ্য বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে সার্ভিস চার্জে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন দেখা দিলে তা করা যেতেই পারে।

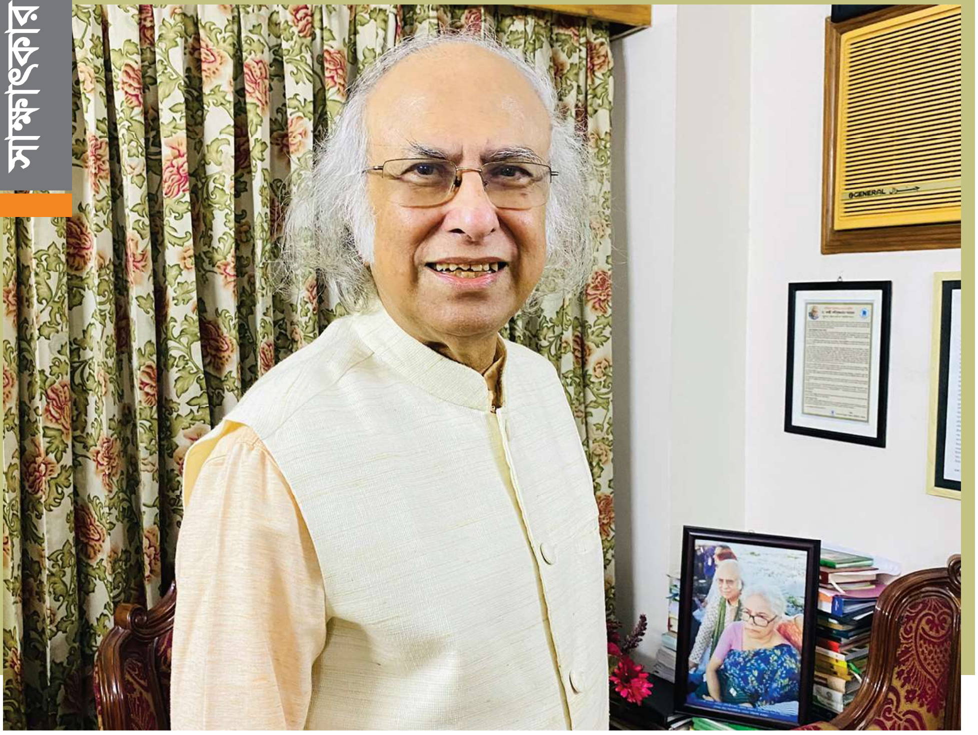

প্রত্যয়: গ্রামীণ ব্যাংকের মতো এনজিও/এমএফআইসমূহও তাদের সদস্যদের নিকট থেকে ডিপোজিট প্রত্যাশা করে। কিন্তু এমআরএ এর কিছু বাধ্যবাধকতা থাকায় বেশি পরিমাণ ডিপোজিট নেয়া যায় না। তাদের তা নেয়ার সুযোগ দেয়া যায় কি না?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: গ্রামীণ ব্যাংক একটি নিবন্ধিত ব্যাংক একটি ব্যাংক ডিপোজিট গ্রহণ করতেই পারে। এনজিওরা তা পারে না।

প্রত্যয়: আপনাদের সহযোগী এনজিওদের সংখ্যা অনেক। সেক্ষেত্রে যথাযথভাবে তদারকি করার মতো জনবল আছে কি?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: তা আছে। আমাদের লোকজনও সবাই প্রয়োজনমত মাঠে থাকে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এএমডি, ডিএমডিসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তারা মাঠে যান, আমি নিজেও যাই। বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তদারকি প্রক্রিয়া আরো ব্যাপক ও গভীর করা হয়েছে এবং আগামীতে তা আরো সমৃদ্ধ করা হবে।

প্রত্যয়: দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রদানের ক্ষেত্রে বড় আকারের এমএফআই প্রতিষ্ঠানসমূহ তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এ সকল ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাংক সুদহার কমানো যায় কি না– আপনার প্রস্তাবনা কি?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : ব্যাংকগুলো তাদের নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলে। ঋণের বিপরীতে জামানতও রাখতে হয়। কোনো ব্যাংক এমএফআইদের কোনো রেয়াত দিবে কিনা তা তাদের হিসাব-নিকাশের উপর নির্ভর করবে। তবে আমার ধারণা মুনাফায় ঘাটতি হয় এমন কাজ কোনো ব্যাংক করবে না। ব্যাংকগুলো অবশ্য কর্পোরেট সোসিয়েল রেসপন্সিবিলিটির-এর আওতায় তাদের মুনাফার একটি নির্ধারিত অংশ সামাজিক কর্মকান্ডে অনুদান হিসেবে দিয়ে থাকে। এই তহবিল থেকে খুব বেশি টাকা এমএফআইদের পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ এই অর্থ থেকে বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন সামাজিক ও জনহিতকর কাজে অর্থায়ন করতে হয়।

প্রত্যয়: ইতোমধ্যে এনজিও/এমএফআই এর উদ্যোগী ভূমিকা ও ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে যাদের আরো অর্থায়ন প্রয়োজন। দেশের ব্যাংকগুলো এখন পর্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছুতে পারেনি যেখানে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। সেক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সক্ষম ও আস্থাভাজন এমএফআইসমূহকে কি প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স দেয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। যদি কোনো এমএফআই ব্যাংকে রুপান্তর করতে হিসেবে সুযোগ দেয়া হয়, তবে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ব্যাংকিং নীতিমালায় চলে যাবে। তবে কোনো কোনো এমএফআই-র কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আগ্রহী বলে আমি শুনেছি। কোনো এমএফআই যদি ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ বা লাইসেন্স চায় তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হবে।

প্রত্যয়: দেশে এনজিও সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের নেটওয়ার্ক এখন ব্যাপক। তারা ক্ষুদ্র অর্থায়ন, কৃষিঋণ, মোবাইল ব্যাংকিং, রেমিট্যান্সসহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমেও ভূমিকা রাখছে। এনজিও/এমএফআইদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাচ্ছি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ: এ বিষয়টি নিয়ে আমি অনেকদিন থেকে ভাবছি। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছে, দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের হার কমে আসছে, সামাজিক অগ্রগতি হচ্ছে, চিন্তায় পরিবর্তন আসছে, কীভাবে নিজেরা এগিয়ে যাবে মানুষের সেই ধ্যান-ধারণায়ও পরিবর্তন আসছে, বিশ্বে আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলে নানা পরিবর্তন ঘটছে। এসব বিবেচনায় নিয়ে এমএফআইদের কার্যক্রম প্রয়োজনমত ঢেলে সাজাতে হবে। অর্থাৎ পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় এনজিওরা যদি কার্যকরভাবে চলমান থাকতে চায় তাদের কার্যক্রমে এবং ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন আনতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনই নেই এমনটি হবে না বলেই আমি মনে করি। তবে তাদের কার্যক্রম এবং কর্ম পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

উন্নত দেশেও এনজিও আছে, তারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে, সমাজসেবা নিয়ে কাজ করে; পরিবেশ নিয়ে কাজ করে, বয়স্কদের নিয়ে কাজ করে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিপতিতদের নিয়ে কাজ করে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় করণীয় নিয়ে আন্দোলন করে এবং এরকম সময়ের দাবি বিবেচনায় নিয়ে অন্যান্য কাজ করে। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, এই বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনসূহের প্রয়োজনীয়তা সবসময়েই থাকবে। কিন্তু এখনও যদি কেউ বিশ্বাস করে যে আমি ক্ষুদ্রঋণ দিয়েই টিকে থাকবো এবং এখন অন্য সে সমস্ত কাজ করছে সেরকম চালিয়ে যাওয়া যাবে তা হলে মনে হয় তার চিন্তায় ভুল রয়েছে। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং তাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঘটেছে, আরো ঘটছে। এই অবস্থায় তাদের টেকসইভাবে এগিয়ে চলা এবং মানব মর্যদায় বসবাসের প্রেক্ষিতে এনজিওদেরকে তাদের করণীয় চিহ্নিত করে কর্মসূচি সাজাতে হবে। পিকেএসএফ-এ এই যে পরিবর্তন ঘটেছে তার সাথে তাল মিলিয়ে নীতি, কর্মসূচি এবং কর্ম-পদ্ধতিতে কী কী পরিবর্তন বা পরিমার্জন প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করার কাজ শুরু করা হয়েছে।

আরো একটি কাজ হাতে নেয়া হয়েছে আর তা হচ্ছে এনজিওদের সাথে একযোগে কাজ করে কীভাবে পরিবর্তিত এবং পরিবর্তনশীল বাস্তবতায় মানুষের পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী কার্যকরভাবে সেবাদান করা যায় সেই লক্ষ্যে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতিতে কেমন পুনর্গঠন ও পুর্নবিন্যাস করার প্রয়োজন হবে তা নির্ণয় করা। যারা বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থা ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটানোর কথা চিন্তা করবে না বা সে ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করবে না তারা সমস্যায় পড়বে বলে আমার ধারণা। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে রেমিট্যান্স পৌঁছে দেয়া, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা ইত্যাদি কার্যক্রম বিভিন্ন এনজিও হাতে নিয়েছে। আগামীতে আরো অনেক নতুন নতুন কাজ বা নতুন নতুন পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে।■

ভালো এমএফআইদের
ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংকের লাইসেন্স দেয়া যেতে পারে

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ

বাংলাদেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদদের একজন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তিনি ২০০৫ সালের ২ মে থেকে ২০০৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৪ বছর এই গুরুদায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন সাবেক সিএসপি কর্মকর্তা।

ছাত্র হিসেবে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, ১৯৭৪ সালে McMaster University কানাডা থেকে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৭৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এমএ পরীক্ষা দেয়ার পরপরই তিনি মাস ছয়েক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন। ১৯৭০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। পরে তিনি সিএসপি হিসেবে পাকিস্তান সরকারের প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দেন এবং লাহোরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭৮ সালে কানাডা থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন শেষে দেশে ফেরার পর তাকে সরকারি চাকরিতে রিকল করা হয় এবং তিনি বাংলাদেশ সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদে যোগ দেন। ১৯৭৯ সালে তিনি পিরোজপুর মহকুমার এসডিও এর দায়িত্ব পান। এরপর আবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। ১৯৮৩ সালে তিনি CIRDAP এ গবেষণা বিভাগের পরিচালক পদে যোগদান করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি কুমিল্লা বার্ডের মহাপরিচালক এবং ১৯৯৫ সালে এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর মহাপরিচালক এবং এরপর পিকেএসএফ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ একজন গুণী লেখক ব্যক্তিত্ব। তিনি ৬০ এর অধিক বই লিখেছেন। দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ জার্নালে তার অসংখ্য আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সরকারের বেশ কটি এজেন্সির উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। দেশের এই কৃতি অর্থনীতিবিদ তার কর্মের স্বীকৃতিসহ নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। তিনি কর্মসুবাদে পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে দেশের বর্ষীয়ান এই অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো :

প্রত্যয়: আপনি বাংলাদেশের একজন সম্মানিত নাগরিক। জীবন চলার এই পথ পেরিয়ে আপনি আজ স্বনামে বিকশিত। আপনার শৈশব-কৈশোর এবং বেড়ে ওঠা সম্পর্কে কিছু বলুন।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা পুরনো ঢাকার মাহুতটুলীতে। তবে আমার পৈতৃক বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার দরিশ্রীরামপুর গ্রামে। আমার আব্বা অনেক আগেই ঢাকায় চলে এসেছিলেন– তবে গ্রামের সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিলো, এখনও আছে। আমরা প্রায় প্রতিবছরই গ্রামের বাড়িতে যেতাম। পরে আমরা বানিয়ানগর ও এরপর পাতলা খান লেনে চলে যাই। পাতলা খান লেন খুব সুপরিচিত জায়গা, ঠিক লক্ষ্মীবাজার বাহাদুর শাহ পার্কের পাশে। আমার শৈশবটা এখানেই কেটেছে। এই এলাকায় সঙ্গীতশিল্পী ফেরদৌসী রহমানের চাচা ও ফরিদা ইয়াসমিনের মামা থাকতেন। আরো থাকতেন বিখ্যাত গায়ক শেখ লুৎফর রহমান। ফলে প্রায়ই এই গুণীজনদের দেখার সুযোগ আমার হতো। এই এলাকাটির যে বিশেষত্ব ছিলো তা হলো এখানে সাংস্কৃতিক আবহ ছিলো এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিলো অতুলনীয়। এই এলাকায় বিহারী ছিলো অনেক। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক তো ছিলোই। একটা মন্দির ছিলো যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় ঘন্টা বাজতো। আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ একটি অসাম্প্রদায়িক পরিবেশেই বড় হয়েছি আমি। এখনকার প্রজন্ম এ রকম পরিবেশে বড় হচ্ছে কি না সে প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ।

আমার কৈশোর কেটেছে নীলক্ষেত এলাকার ইকবাল হলের পেছনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায়। খুবই চমৎকার ছিলো এলাকাটি। গাছে পরিপূর্ণ। আমি নিয়মিত ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে যেতাম, সপ্তাহে এক দিন বিনা পয়সায় ওরা সিনেমা দেখাতো। এই এলাকাতেও প্রতিবেশী হিসেবে ড. আনিসুজ্জামান ও ড. মনিরুজ্জামানের মতো অনেক গুণীজনকে পেয়েছি। ড. আনিসুজ্জামানের সাথে তো আমাদের পারিবারিক সম্পর্কও ছিলো। এ পর্যায়ে আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ও মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমার সহপাঠী ছিলো, তবে ওরা ছিলো আর্টসের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমি অবশ্য কাকতালীয়ভাবে অর্থনীতি নিয়ে পড়েছি।

প্রত্যয়: এটা কি আসলেই কাকতালীয় ঘটনা ছিলো নাকি অন্য কোনো কারণে অর্থনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: স্কুল জীবন থেকেই আমি পড়ুয়া ছাত্র ছিলাম না। তবে রেজাল্ট ভালোই ছিলো। ইন্টারমিডিয়েটের পর মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এও চান্স পেয়েছিলাম। কিন্তু ভর্তি হই হই করে আর হওয়া হয়নি। কলেজ জীবন থেকেই আমি বাম রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। এক দিন হঠাৎ করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টিতে গিয়ে বিখ্যাত অধ্যাপক ড. এন এম মাহমুদের সাথে দেখা করলাম। আমি ফরম ফিলাপ করে জমা দিতেই তিনি ভর্তির অনুমতি দিয়ে দিলেন। তবে প্রথম এক বছর অর্থনীতি আমাকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি। পুরো বিষয়টাই জটিল মনে হতো। তবে ড. মাহমুদের ক্লাসগুলো আমার বেশি ভালো লাগতো। তিনি বামপন্থী রাজনীতির অনুসারী ছিলেন। তিনি প্রচলিত অর্থনীতির চেয়ে ক্লাসে বেশি আলোচনা করতেন মার্ক্সের দর্শন ও এর সমালোচনা। আমি এগুলো এনজয় করতাম। এরই ধারাবাহিকতায় আমি ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেই। আমি ছিলাম মেনন গ্রুপে। রাশেদ খান মেনন ছিলেন সভাপতি আর আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া ছিলেন জেনারেল সেক্রেটারি। আমি ছাত্র ইউনিয়নের এস এম হলের সভাপতি ছিলাম। এস এম হলের কমিটি সে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমার একটি স্মরণীয় ঘটনা ছিলো, যে মিছিলে আসাদ গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলেন সেই মিছিলে আমিও ছিলাম। আমি কিছুটা পেছন দিকে ছিলাম, আসাদ ছিলো সামনের সারিতে। কলেজে থাকাকালীন আমরা ঢাকা কলেজ থেকে একটি মিছিল বের করেছিলাম। পুরনো রেলওয়ে হাসপাতালের সামনে আসার পর পুলিশ দুই দিক থেকে আমাদের ঘেরাও করে। এ সময় ঢাকা কলেজের প্রায় চল্লিশ জন ছাত্র গ্রেফতার হয়। তবে আমিসহ আরো অনেকে দৌড়ে গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হই।

তো যা বলছিলাম, সে সময়ে আমাদের সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও আর্টস ফ্যাকাল্টি। সে সময় মতিঝিল পাড়া কিংবা নীলক্ষেতে কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে চলাচলের অভ্যাস আমাদের ছিলো না। খুব সুন্দর একটি পরিবেশে আমরা শিক্ষা ও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছি। শিক্ষা বলেন, সংস্কৃতি চর্চা আর খেলাধুলাই বলেন আর রাজনীতিই বলেন– সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র ছিলো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। এখন অবশ্য এ রকম কিছু আর নজরে পরে না।

প্রত্যয়: আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: এম এ পরীক্ষা দেয়ার পরপরই আমি মাস ছয়েক চাকরি করেছি পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে। রেজাল্ট প্রকাশিত হবার পর ১৯৭০ সালে ড. হুদার পরামর্শে অর্থনীতি বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দেই। এরপর লাহোরে CSP ক্যাডারের প্রশিক্ষণ নেই। ১৯৭৩ সালে আমি পিএইচডি করার জন্য কানাডা চলে যাই। ১৯৭৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করলাম। দেশে ফিরে আসার পর সরকারি চাকরিতে আমাকে রিকল করা হলো, আমি ঢাকায় অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার হিসেবে জয়েন করলাম। জনাব মুয়িদ চৌধুরী ছিলেন আমার প্রথম বস। তিনি ছিলেন ডেপুটি কমিশনার আর আমি অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার। তখন আমিই ছিলাম বাংলাদেশের একমাত্র অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার। কারণ হলো, সিএসপিদের প্রথম পোস্টিং হয় অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার হিসেবে। বাকিরা ছিলো ম্যাজিস্ট্রেট- কেউ প্রথম শ্রেণির, কেউ দ্বিতীয় শ্রেণির। ১৯৭৯ সালে আমি পিরোজপুর মহকুমার এসডিও হিসেবে যোগদান করি। সে সময় বরিশাল জেলার নাম ছিলো বাকেরগঞ্জ। তখন আমার বেতন ছিলো চৌদ্দশ টাকা। তাতেই আমার চলে যেতো। এরপর আমি ঢাকায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে চলে আসি। তারপর ১৯৮৩ থেকে CIRDAP এ গবেষণা বিভাগের পরিচালক হিসেবে কাজ করি। ১৯৯৩ সালে আমি কুমিল্লার বার্ডের ডিজি হিসেবে নিয়োগ পাই। সেখান থেকে ১৯৯৫ সালে এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর মহপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। মূলত এই কারণেই বেশিরভাগ এনজিওগুলোকে বেশ ভালোভাবেই আমি চিনি-জানি। সে সময় এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো অফিস ছিলো মৎস্য ভবনে। এরপর আমি যোগ দেই পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ-এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে।

প্রত্যয়: বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে আপনার কাছে জানতে চাই– এ দেশের অর্থনীতি কতোদূর এগিয়েছে। আমাদের উন্নয়নের ভিত কতোটা মজবুত বলে আপনি মনে করেন?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যখন জন্ম হলো তখন অনেকেই ভেবেছিলো এতো ছোট ভূখন্ডে সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যার রাষ্ট্রটি খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়া আমাদের তেমন কোনো সম্পদ ছিলো না। সে জন্যই তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বিদ্রূপ করে বাংলাদেশকে বলেছিলেন 'তলাবিহীন ঝুড়ি'। আর স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলোর একদল অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'উন্নয়নের পরীক্ষা' হিসেবে। এর অর্থ হলো, বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারবে কি না তা বিশ্বের জন্য একটি দেখার বিষয়। কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও

পঞ্চাশ বছর পর বাংলাদেশ একটি সন্তোষজনক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি উল্লেখ করার মতো। আমি বলবো, অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক ছেদ পড়েছে, অনেক বিচ্যুতি ঘটেছে কিন্তু এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমাদের প্রতিটি সরকারই বরাবরই দাবি করে তাদের আমলেই সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু আমার কথা হলো, অর্থনৈতিক অগ্রগতি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই অগ্রগতি আগামী দিনগুলোতে আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নব্বই এর দশকে দারিদ্র্যের হার ছিলো ৫০ শতাংশ, এখন সেটি ২২-২০ শতাংশে নেমে এসেছে। কৃষি খাতেও আমাদের অর্জন অভাবনীয়। শতভাগ না হলেও আমরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছি। আমাদের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে আর মুল্যস্ফীতিও সহনীয় পর্যায়ে আছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে আমরা বেশ ভালো অবস্থানে আছি। তবে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জও আছে। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে, প্রবৃদ্ধি বেড়েছে কিন্তু সমতাভিত্তিক উন্নয়ন এখনো পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। আমাদের দেশে আয়ের বৈষম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, একই সাথে সম্পদের বৈষম্যও রয়ে গেছে। এগুলো প্রকৃত উন্নয়নের সহায়ক নয়। আরেকটা বিষয় হলো, প্রবৃদ্ধির দিকে নজর দিতে গিয়ে সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচক যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। আমাদের স্কুল-কলেজের সংখ্যা অনেক কিন্তু শিক্ষার মান এখনো সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেনি। আমাদের স্বাস্থ্য খাতে আরো বেশি নজর দেবার প্রয়োজন আছে। তবে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা একটি মডেলে পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার কমানো, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, টিকা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে আমরা অন্যদের জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখি। আর এই অর্জনের পেছনে শুধু যে সরকারের অবদান রয়েছে তা নয়, বেসরকারি সংস্থাগুলো ব্যাপকভাবে এ খাতের উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতা করেছে। একই সাথে কৃষি খাত বিশেষ করে মৎস্য, গবাদি পশু ও ফসল উৎপাদনে কৃষকের পাশাপাশি অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং এখনো আমাদের সামনে যে বড় চ্যালেঞ্জগুলো রয়ে গেছে তা হলো, আয় ও সম্পদের বৈষম্য কমানো, সামাজিক বৈষম্য কমানো এবং মানুষের উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে রূপান্তর করতে হবে।

প্রত্যয়: আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ। আপনি এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক এবং পিকেএসএফ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দায়িত্বও পালন করেছেন। দেশের অর্থনীতির এক বিশাল অংশ জুড়ে এখন ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে এই সেক্টরের কতোটা প্রভাব পড়ছে বলে আপনি মনে করেন?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: পিকেএসএফ এর কাজ হলো মাইক্রোক্রেডিট এবং এনজিওদের সহায়তা করা। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে সরকার সব কিছু করতে পারে না এবং এটা কাম্যও নয়। গণমানুষের কাছে পৌছাতে হলে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হবে। কারণ, তারা জনগণের কাছাকাছি যাবে এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে। টাঙ্গাইলের একটা গ্রাম এবং পঞ্চগড়ের একটা থানা আর বরিশালের চাহিদা কিন্তু এক না। একটি জেলার বাজেট সব জায়গার জন্য প্রযোজ্য নয়। এক জায়গায় রাস্তা লাগবে অন্য জায়গায় স্কুল কিংবা হাসপাতাল লাগবে। কাজেই সব জায়গায় প্রয়োজনীয়তা কিন্তু এক রকম না। তাই এই কাজগুলো করার জন্য এনজিওদের অবদান লাগবে। কোভিডের সময় আমরা স্বাস্থ্য খাতের নানা অনিয়ম-দুর্নীতি দেখেছি। এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল যদি এনজিওদের এর সাথে সম্পৃক্ত করা যেতো, যা এখনো করা হয়নি।

সরকারি আমলাদের একটা ট্যান্ডেন্সি হলো বেসরকারিদের দূরে রাখা। আমি মনে করি বাংলাদেশের উন্নয়নে এনজিওদের ভূমিকা অনেক বেশি। মানুষের কর্মসংস্থান, কৃষি, এসএমইর উন্নয়নে এনজিওদের অবদান অনেক। এখানে মাইক্রোক্রেডিট বা ক্ষুদ্রঋণের একটা বিশেষ অবদান আছে। আসলে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়া কোনো কাজই সঠিকভাবে করা যাবে না। আর মাইক্রোক্রেডিট সেই জায়গাটি দেখিয়ে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মহিলারা অর্থের সঠিক ব্যবহারের ব্যাপারে যথেষ্ট বিজ্ঞ। অর্থের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে তারা নিজেদের জীবনমানের যেমন উন্নতি করছে, তেমনি তার পরিবার এবং একই সাথে এলাকার উন্নয়নেও অবদান রাখছে। গ্রামের মহিলারা যখন ঋণ নেয় তখন তারা সেই টাকায় বিলাসিতা না করে বিভিন্ন কাজের পেছনে ব্যয় করে, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায়, নলকূপ কিংবা স্যানিটারি ল্যাট্রিন বসায়। এই কাজগুলো তো সরকারের করার কথা, কিন্তু সরকার সবসময় তা করতে পারে না এবং সরকারের কাছে কাম্যও নয় যে সব কাজ সরকার করবে। এই ব্যাপারে বাংলাদেশের এনজিওদের অবদান অনেক বেশি। তবে আমি মনে করি, এনজিওদের স্ট্র্যাটেজি তাদের প্রক্রিয়াটা একটু যুগোপযোগী করতে হবে। এখন মানুষের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে। তাদের ১০/২০ হাজার টাকায় হবে না আরো বেশি টাকার প্রয়োজন হবে। অনেকে সিন্ডিকেশন লোন থেকে বেরিয়ে একক লোনের দিকে ঝুঁকছে। তারপর মার্কেটিংটাকে কীভাবে ডেভেলপ করা যায়,

ব্যাংকের ঋণের সাথে কীভাবে লিংক করা যায় এ বিষয়গুলোতে তাদের নজর দিতে হবে। এখানে পিকেএসএফ এর কাজ করার আছে। পিকেএসএফ উত্তরবঙ্গ, রংপুর, দিনাজপুরে ইনোভেটিভ প্রজেক্ট করেছে। অন্যান্য যে এনজিওগুলো যেমন ব্র্যাক, আশা, বুরো বাংলাদেশ, ইএসডিও, সিডিও তারা কিন্তু এখন শুধু কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ না বহুমুখী কাজেও সম্পৃক্ত হচ্ছে। সার্বিকভাবে আমি মনে করি এনজিওগুলো তাদের কাজগুলো ভালোভাবেই করছে।

প্রত্যয়: এনজিওদের এ ধরনের কাজে মনস্তাত্ত্বিক একটা প্রভাব আছে, হ্যাপিনেস ইনডেক্স যেটাকে বলা হচ্ছে সেটার মধ্যেও নিশ্চয় একটা প্রভাব পড়ে– মানুষ ভাবে যে আমরা কোথাও না কোথাও থেকে অর্থ পাবোই এবং তার জন্য এনজিওরা আছে। অর্থনীতিতে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় কি না?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: হ্যাঁ, এনজিওদের একটা সুবিধা এই যে প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ মানুষের কাছাকাছি থেকে কাজ করে। সময়-অসময়, বিপদআপদে তারা যাবে। দ্বিতীয়ত এনজিওদের মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা বুঝতে পারে যে, এই লোকগুলোর কি প্রয়োজন। সমস্যাটাই বা কি। সেদিক থেকে দেখলে এনজিওরা মোটামুটি কাছের মানুষ। একজন সরকারি অফিসারের কাছে তারা সহজে যেতে পারেন না, তাছাড়া সরকারি অফিসারদের নানা রকম দায়িত্ব থাকে। সেদিক থেকে আমি বলবো যে উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণে এনজিওরা বিশেষ ভূমিকা রাখে।

প্রত্যয়: ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় পিকেএসএফ বিভিন্ন এনজিওদের ঋণ প্রদান করে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সহায়তায় অন্য ব্যাংকগুলোও 'ব্যাংক-এনজিও লিংকেজ' ঋণ সহায়তা দেয়। এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরবেন কি?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: প্রথমত হলো ফাইন্যান্স খুব গুরুত্বপূর্ণ। গ্লোবালি ডোনারদের প্রেফারেন্স কমে গেছে। বিশেষ করে ডোনাররা এখন এ অঞ্চলের চেয়ে আফ্রিকার দিকে নজর দিচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের এনজিওদের ফান্ড মবিলাইজেশনের জন্য ডোনারদের থেকে যতটুকু নেয়া সম্ভব এবং তাদের সদস্যদের কাছ থেকে সঞ্চয় নিয়ে সেটা করছে। আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ হলো এনজিওদের ফর্মাল ব্যাংকের সাথে লিংকেজ আনা। লিংকেজ আনার জন্য এরই মধ্যে কিছু কিছু ব্যাংক মাইক্রোক্রেডিটে এনজিওদের সহায়তা দেয়। তবে আমি মনে করি এই লিংকেজটা খুব গভীরভাবে হয়নি। এখানে এমআরএর একটা ভূমিকা থাকতে পারে। এমআরএ যদিও রেগুলেটরি এজেন্সি তবুও কিছু নীতিমালা এনজিওদের জন্য করতে পারে এবং ব্যাংকারদের সাথে কিছু কিছু ওপেনআপ করতে পারে।

ব্যাংক কিন্তু সব জায়গায় শাখা খুলতে পারে না। সরকারি ব্যাংকগুলো ছাড়া বেসরকারি ব্যাংকের পক্ষে শাখা খোলা তো খুবই কঠিন। সেসব ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করতে পারে। অনেক ভূইফোঁড় সংস্থা, নানারকম সেভিংস সোসাইটি গ্রামে গিয়ে লোকজনের টাকা মেরে দিচ্ছে। এদের থেকেও রক্ষা পেতে হলে এনজিও-ব্যাংকের লিংকেজটা বিশেষ প্রয়োজন। যেমন ভারতে National Bank for Agriculture & Rural Development- NABARD আছে। সেটা কিন্তু লিংকেজ ব্যাংক। তাই ব্যাংক-এনজিও মিলে যদি লিংকেজ না করে তা হলে যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বলছি সেটা কিন্তু হবে না, ডিফিকাল্ট হবে। এনজিওদের এখন অনেক বরোয়ার আছে, যারা এসএমই, কুটির শিল্প ডাইভারসিফাই হচ্ছে, কিছু কিছু প্রোডাক্ট তো এক্সপোর্টও হচ্ছে। শুধু দেশের জন্য না বিদেশে রপ্তানির জন্যও কিন্তু দরকার লিংকেজ স্থাপন করা।

প্রত্যয়: এমএফআই যারা বর্তমানে এমআরএর লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিশেষ করে বুরো বাংলাদেশ, ব্র্যাক, টিএমএসএস, সাজেদা ফাউন্ডেশন ক্যাপিটাল মার্কেটে চাচ্ছে বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে ফান্ড সংগ্রহ করার জন্য এবং এমআরএ ও সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদনেই এটা করছে। ব্র্যাক ইতোমধ্যে ১৩৫০ কোটি টাকা ফান্ড রেইজ করেছে, বুরোসহ অন্যরা প্রসেসে আছে। ক্যাপিটাল মার্কেটে এমএফআইদের প্রবেশটাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: ক্যাপিটাল মার্কেটে যেতে হলে বিএসিসির কতগুলো প্রক্রিয়া আছে। তার মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, অডিট রিপোর্ট ঠিক করা। ছোটখাটো এনজিও যারা আছে তারা সঠিকভাবে হিসাব রাখে না। ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড না হলে এটা হবে না। আরেকটা হলো ব্র্যান্ড বা ইমেজ। প্রতিষ্ঠানের ভালো ইমেজের ওপর অনেক নির্ভর করে। তাই ম্যানেজমেন্ট, অডিট রিপোর্ট এবং ইমেজের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, এমএফআইরা যাদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে তাদের টাকা ফেরত দেয়ার দায়টাও নিতে হবে। এমএফআই ফেল করলে তাদের আর্থিক ক্ষতি হবে। ব্যাংকে টাকা রাখলে যদি কোনো কারণে ব্যাংক ফেল করে তার দায়টাও ব্যাংক নেবে। এক্ষেত্রে এমএফআইদের সেই দায়িত্বটা নিতে হবে।

আমি পিকেএসএফ এ থাকতে অনেক ব্যাংকার এবং দেশের বাইরে থেকে হংকং থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল যে তারা ফান্ডিংয়ের ব্যাপারে পিকেএসএফ এর সাথে অংশগ্রহণ করতে চায়। তখন এমআরএ হয়নি, আমি বলেছিলাম এটা এখন ডিফিকাল্ট হবে। এখন এমআরএ'র একটা আলাদা অ্যাক্ট আছে। সেটার ভিত্তিতে করা যায়। আমার মনে হয় এদিকে ইক্যুইটি জোগার করার সাথে সাথে ব্যাংকের সাথে লিংকেজ রাখলে ভালো হয়। ব্যাংকে অনেক লোন আসে তারা বড় বড়দের টাকা দিয়ে দিচ্ছে। ব্যাংকের টাকাটা কেন্দ্রীভূত। এই টাকা যদি ডাইভারসিফাই করতে হয় তা হলে এনজিওরা একটি ভালো বিকল্প।

প্রত্যয় : ব্যাংকের যে সুদহার, কৃষিঋণের ব্যাপারে তারা সেই সুদহার কমিয়ে দিয়েছে। এনজিওদের জন্য কি সুদহার কমিয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: এটা করতে পারে। যেমন সরকারের কতগুলো নির্দেশনা আছে বহু আগে থেকে– মসলা, বীজ, সবজি প্রভৃতির ক্ষেত্রে সাবসিডিজ লোন দেয়ার জন্য। এটা করা হয় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এনজিওরাও যদি কোনো একটা হতদরিদ্র গোষ্ঠীর জন্য ইনোভেটিভ কাজ করে সেটা শস্য, পশুর খামার, মাছের খামার কিংবা মৌচাষ যেটাই হোক তখন হয়তো সরকারের ব্যাংকগুলোকে বলতে পারে এনজিওদেরকে সহায়তা করার জন্য।

কোনো ব্যাংক থেকে যদি ফান্ড না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে এনজিওরা নিজেদের ফান্ড ব্যবহার করতে পারে। কারণ, সেভিংসের ওপরও একটা ফান্ড রিফান্ড দিতে হয়, প্লাস কস্ট অব সুপারভিশন, ফিল্ড ওয়ার্কারের বেতন দিতে হয়। এনজিওরা যদি ১০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে সেটা দেখভাল করার জন্য আরো ১০ জন লোক নিয়োগ দিতে হয়, বাড়ি বাড়ি মিটিং করতে হয় তখন কষ্ট বেড়ে যায়, ব্যাংক কিন্তু সেটা করে না। সেক্ষেত্রে এনজিওদের কস্ট অব ফান্ড কমাতে হবে এবং সার্ভিস চার্জটাও একটু একটু করে বাড়াতে হবে। তবে ব্যাংকের মতো ৯% রাখলে হবে না এটা বাড়াতে হবে।

প্রত্যয়: এনজিও/এমএফআইসমূহ শুধু তাদের গ্রাহকদের নিকট থেকে সঞ্চয় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু দেশের অসংখ্য মানুষ এখন পর্যন্ত ব্যাংকিং সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ প্রেক্ষিতে এনজিওগুলোকে "Public Savings" গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া যায় কি না? আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: এটা দেয়া যেতে পারে। তবে এটা সিলেক্টিভ বেসিসে করতে হবে। এমআরএ থেকে অ্যাসেসমেন্ট করে দেখবে যাদের ইনস্টিটিউশনাল ভায়াবিলিটি

এবং ফাইন্যান্সিয়াল ভায়াবিলিটি আছে কি না। এগুলো অ্যানালাইসিস করে ভালো এনজিও নির্বাচন করে স্পেশালি কিছু স্বল্পমেয়াদি সেভিংস গ্রহণের সুযোগ দেয়া যেতে পারে ডেইলি বেসিসে না, কারণ এটা খুব ডিফিকাল্ট। অতএব স্বল্পমেয়াদে কিছু ডিপোজিট নিতে পারে এবং এটাকে মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ দিতে হবে। ফলে অসৎ সঞ্চয়কারী যারা আছে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

প্রত্যয়: এখানে যদি সরকার পাবলিক সেভিংসের পারমিশন দেয়ও তা হলে ব্যাংকগুলো এটাকে কীভাবে নেবে? কারণ তারাও সেভিংস নিতে পারে আবার এনজিওরা সেভিংসের পারমিশন পেয়ে গেলে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: সহজেই নিতে পারবে না– ব্যাংক এটার বিরোধিতা করবে। আর আইনি কাঠামোতে নেই। স্পেশাল বিষয় বলে কয়েকটি মেয়াদি অ্যাকাউন্ট গ্রহণের অনুমতি দেবে ডেইলি অ্যাকাউন্টের জন্য অ্যালাউ করবে না। যেমন আইপিডিসি, আইডিএলসি তারা স্বল্পমেয়াদি ডিপোজিট নিতে পারে এখন সেটা ৬ মাস আমার সময় ছিল ১ বছর।

প্রত্যয়: আপনার সময়েই এমআরএ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এর নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। তখন যে উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছিল তার বাস্তবায়ন কতোটা হয়েছে– এ ব্যাপারে আপনার আরো কোনো প্রস্তাবনা আছে কি?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: এমআরএ আমার সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আমি তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা ফ্লোরই ছেড়ে দিয়েছিলাম তাদের জন্য। কারণ, তখন তাদের কোনো অফিস ছিল না। এমআরএর চেয়ারম্যান তো এক্স অফিসিও গভর্নর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর চার্জে ছিলেন। এমআরএ শুরুটা ভালোই করেছিল এবং মোটামুটি দক্ষ লোকবল ছিল। ডিএফআইডি তখন এমআরএকে একটা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দিয়েছিল। এখন এমআরএ প্রতিষ্ঠিত এবং এখানে যারা আগে থেকে আছেন তারা মোটামুটি অভিজ্ঞ এবং নতুন লোকজনও ভালো করছে।

এমআরএর কতগুলো রুলস আমি দেখেছি। তবে তাদেরকে আর একটু যুগোপযোগী হতে হবে। এমআরএর অধীনের এনজিওগুলোর কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করতে হবে। লোনের পরিমাণ বাড়ানোর ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারে। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এমআরএকে এনজিওদের মনিটর করতে হবে। যেমন ব্যাংকের কতগুলো ক্যামেলস রেটিং আছে। ক্রেডিট রেটিং, লিকুইডিটি, ম্যানেজমেন্ট, আর্নিং এই বিষয়গুলো আছে। এমআরএ এগুলো সম্পর্কে নীতিমালা দিতে পারবে এবং ক্রেডিট রেটিংস এজেন্সিরা এগুলো করবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এমআরএ লাইসেন্সপ্রাপ্ত এনজিওগুলোর সাথে কনস্ট্যান্ট ইন্টারঅ্যাকশন করতে পারে। যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক মান্থলি মিটিং করে সব ব্যাংকারদের সাথে।

প্রত্যয়: বর্তমানে প্রায় ৭৫০ এমএফআই আছে এমআরএর লাইসেন্সপ্রাপ্ত। আপনি কি মনে করেন এটা বাড়ানোর সুযোগ আছে? নাকি একটা লিমিটেশন দরকার আছে এই সেক্টরের ভূমিকার জন্য? নাকি হাজার বারোশ ছাড়িয়ে যাবে?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করা ঠিক হবে না। তবে ঢালাওভাবে লাইসেন্স দেয়াটা ঠিক হবে না। কারণ, এভাবে লাইসেন্স দিতে গিয়ে ব্যাংকের কি অবস্থা হয়েছে আমরা দেখেছি। এমআরএকে দেখতে হবে যারা ইতোমধ্যে লাইসেন্স পেয়েছে তাদের কার্যক্রমের সফলতা কি? তারা কতোটুকু কাভার করছে। কতোটা গভীরে গেছে। একজন উদ্যোক্তাকে টাকা দেয়ার জন্য সে কি করছে? সে খেয়েপরে আছে সেটা যথেষ্ট না, সে কতোটা স্বাবলম্বী হয়েছে সেটা দেখতে হবে। এগুলো দেখার পর যদি মনে করে গ্রোথ এক্সপানশন দরকার সেক্ষেত্রে কিছু দিতে পারে। তারপরও সেটা করার আগে কারা কারা কাজ করছে, নতুন যারা আছে তাদের স্কোপটা কি রকম এটা দেখে এক্সপানশন করতে পারে।

প্রত্যয়: ইতোমধ্যে এনজিও/এমএফআই এর উদ্যোগী ভূমিকা ও ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে যাদের আরো অর্থায়ন প্রয়োজন। দেশের ব্যাংকগুলো এখন পর্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছুতে পারেনি। সেখানে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। সেক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সক্ষম ও আস্থাভাজন এমএফআইসমূহকে কি প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স দেয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: ভালো এনজিও এবং ভালো এমএফআই যদি থাকে তা হলে সরকার চিন্তা-ভাবনা করতে পারে ক্ষুদ্র বা এমএফআই ব্যাংকের বিষয়ে। সেটা করা যেতে পারে আঞ্চলিক কিংবা পার্টিকুলার এলাকার জন্য। পুরো দেশের জন্য একজনকে দিলে সেটা কঠিন হয়ে যাবে। মূলত প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে ব্যাংকের শাখা নেই, এমনকি অনেক এনজিওর সংখ্যা অনেক কম সেখানে ব্যাংক এবং এনজিওর যৌথ উদ্যোগে একটা পার্টিকুলার এমএফআই ব্যাংক হতে পারে।

আমি যতটুকু শুনেছি পাকিস্তানে আশা ইন্টারন্যাশনাল আছে। সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক লাইসেন্স দেয়ার সিদ্ধান্ত ইদানিং নিয়েছে।

প্রত্যয়: সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ঠাকুরগাঁও এর এনজিও ESDO'র নির্বাহী পরিচালক প্রশ্ন রেখেছেন– ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো যদি ব্যাংক করে তা হলে জনগণ এটাকে কীভাবে নেবে? তারা কি দূরে সরবে নাকি আরো কাছে আসবে?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: জনগণ যেটা চায় সেটা হলো যেকোনো ব্যাংকই

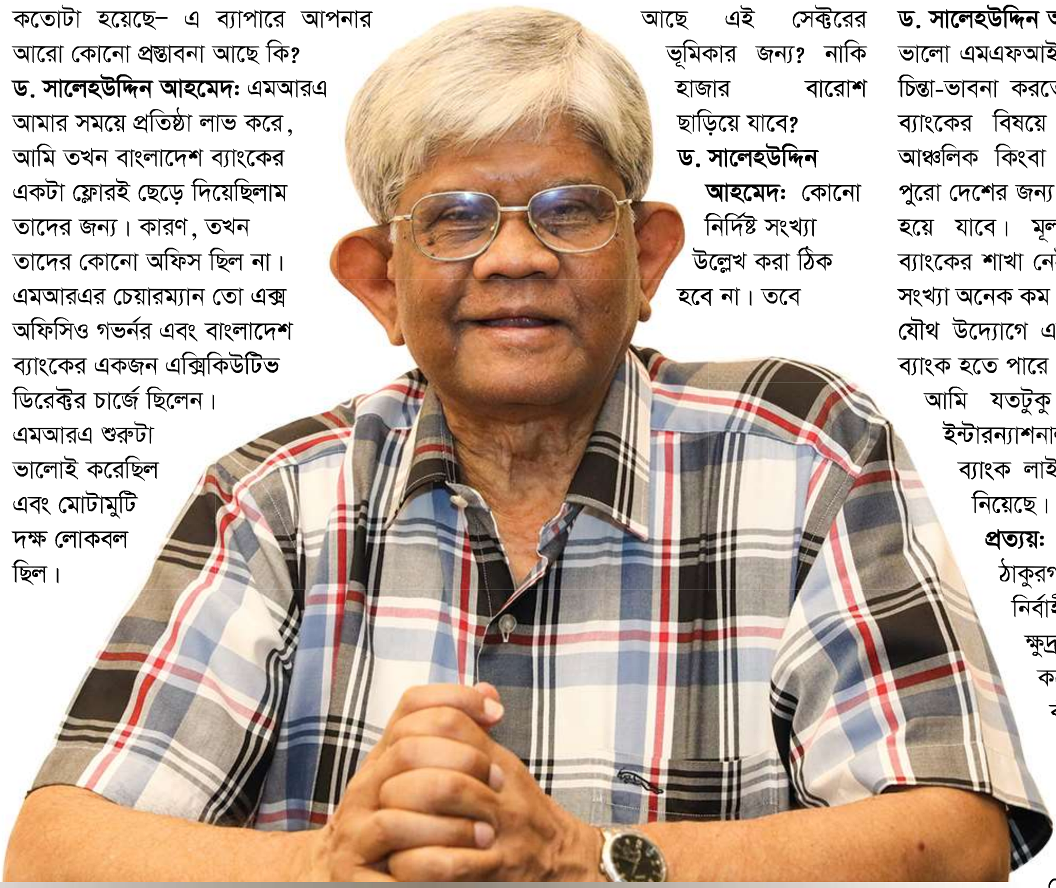

যখন শাখা খোলে তখন জনগণ দেখে ব্যাংকের ইমেজটা কি? সাধারণ মানুষ সেটা দেখেই টাকা জমা করে। সিমিলারলি এনজিওরা যখন ব্যাংক করবে তখন মানুষ দেখবে যে কোন এনজিও। আর যেখানে ব্যাংক খোলা হবে সেখানে দেখতে হবে লোকজনের কাছে ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। হঠাৎ করে একটা ব্যাংক খুলে দিলে দেখা গেল যে সেখানকার লোকজন ব্যাংকিং করছে না।

প্রত্যয়: বর্তমানে দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে। এনজিও/এমএফআইগুলোও ডিজিটালাইজেশনের এই অগ্রযাত্রায় নিজেদের সংযুক্ত করেছে। ঋণ উত্তোলন, ঋণের কিস্তি পরিশোধ, সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন, কৃষি সেবাসহ অন্যান্য অনেক সেবাই এখন ডিজিটাল প্লাটফর্মে প্রদান করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন কি?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: এটা খুবই ইতিবাচক। এখন বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়েছে। তবে এখানে প্রযুক্তিটাকে আরেকটু ফ্রেন্ডলি করতে হবে। বিশেষ করে আইটি সেফটিতে নজর দিতে হবে। বাংলাদেশে মোবাইল ফাইন্যান্স সার্ভিস নিয়ে খুব মাতামাতি হচ্ছে। কিন্তু তাদের আইটি সিকিউরিটি, মানি লন্ডারিংসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জালিয়াতি হচ্ছে। তাই আইটি সিকিউরিটিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ ডিজিটালাইজেশনকে সাকসেসফুল করতে হলে আইটি সিকিউরিটিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রত্যয়: এনজিও/এমএফআই খাত জাতীয় উন্নয়নের একটি বড় খাত। এ খাতের কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে আপনার প্রস্তাবনা কি?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: এনজিও/এমএফআই কর্মীদের সামগ্রিকভাবে ওরিয়েন্টেশন বা ট্রেনিং দিতে হবে যে প্রায়োরিটি, ডেভেলপমেন্ট এবং বাংলাদেশের কনটেক্সটা, ফিন্ডের প্রয়োজনীয়তা অ্যাকসেস করা এবং তার মধ্যে প্রোগ্রাম ফর্মুলেট করা, ইম্পিলিমেন্টেশন মনিটরিং সম্পর্কে জানা। মাঠ পর্যায়ের একজন কর্মীকে অর্থনৈতিক ইস্যুটা জানতে হবে, লোকজনের সাথে কীভাবে কথা বলতে হবে, তাদের সাথে রিলেশনশীপ কমিউনিকেশন করার দক্ষতা বাড়াতে হবে। সে কীভাবে মনিটর করবে, ফলোআপ করবে এগুলো শিখতে হবে। যেহেতু ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ করবে টাকা পয়সা নিয়ে কাজ করবে, তাকে যে একেবারে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে হবে তা না, কিছুটা হিসাব-নিকাশের জ্ঞান থাকতে হবে। আমি মাঝে মধ্যে প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য দিতে যাই, সেখানে বিভিন্ন এনজিও সংস্থার অফিসাররাও আসেন এবং তারা পলিসি ওরিয়েন্টেশনটাও চায়। মনিটরি পলিসি কীভাবে ফর্মুলেট করে, ফিসক্যাল পলিসি, সরকারের বাজেট ম্যানেজমেন্ট–এই বিষয়গুলো ওপরের লেবেলে জানা উচিত। রিস্ক ট্র্যাকিংয়ে হেজিং কীভাবে করে, সিকিউরিটাইজেশন এবং ফ্যাক্টরিং (Factoring) এই ধরনের প্রোডাক্ট সম্পর্কে আইডিয়া থাকা দরকার। কনসালট্যান্ট কিংবা ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপার্ট নিলেও নিজেদের মধ্যে একটু ওরিয়েন্টেশন থাকা দরকার টপ ম্যানেজমেন্টে।

প্রত্যয়: বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট ইনেস্টিটিউটে তো আমাদের এক্সেস নেই। মনিটর পলিসি কিংবা বাজেট কীভাবে হয় এসব বিষয়ে জানার জন্য সেখানে তো আমাদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। পিকেএসএফ এর এমডি থাকা অবস্থায় আপনি একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের জন্য একটা স্থায়ী ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন কিংবা একডেমি প্রয়োজন। কিন্তু সেই উদ্যোগটা ফলপ্রসূ হয়নি। আমি পার্টিকুলারলি বলতে চাই আইএনএম থাকতে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে নাকি নতুন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: আইএনএম এর ব্যাপারে আমি একটু হতাশ। কারণ আমার সময়েই আইএনএম হয়েছিল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ক্যাপাসিটি বিল্ড করবে। কিন্তু আমি আসার পর দেখলাম সব রিসার্চ এবং অনেক লোকজন নিয়ে হাইরেটেড ইকোনমিস্টদের নিয়ে রিসার্চ করেছে। সেই রিসার্চ পেপার আমিও পেয়েছি, ইন্টারেস্টিং, গুড রিডিং। কিন্তু উচিৎ ছিল একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করা। যেমন কুমিল্লা একাডেমী (বার্ড) তো বেস্ট রিসার্চ ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের কাজ করছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল সার্ভিসের লোকজন এখনো বার্ডে যায়। কারণ, তারা জানে যে, রুরাল ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে জানতে হলে বার্ডে যেতে হবে। তো আইএনএম এর উচিত এখন একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করা। আইএনএম যদি না করে বিআইবিএম এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রত্যয়: দেশে দারিদ্র্য নিরসনের জন্যই একসময় এনজিও/এমএফআই সৃষ্টি হয়েছিল। দেশ এখন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাটা ভালো। এক সময় হয়তো দরিদ্রও থাকবে না। সেক্ষেত্রে এনজিও সেক্টরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: উন্নয়নের ব্যাপারে কিংবা সেবাদানের ব্যাপারে এনজিওদের অবশ্যই একটা ভূমিকা থাকবে। সরকার হলো একটা বিরাট জাহাজের মতো। জাহাজ যেমন মূল বন্দরে অনেক সময় ভিড়তে পারে না তখন গভীর বন্দর থেকে লাইটার জাহাজে করে মালামাল মূল বন্দরে আনতে হয়। এ জন্যই প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়ার জন্য এনজিও এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দরকার আছে। সরকার দেশের জন্য হুট করে একটা সেক্টরের জন্য পার্টিকুলার কোনো আইন করতে পারবে না। সেই সেন্সে এনজিওদের আরো কন্ট্রিবিউশন লাগবে। সে কারণেই আমি বলি যে, এনজিওদের আরো ডায়নামিক এবং যুগোপযোগী হতে হবে। লক্ষ্য থাকবে সরকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চলা। কারণ, গন্তব্যস্থল দুটোরই এক– মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং মানুষের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা।

প্রত্যয়: আপনি একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং কলামিস্ট। একজন অর্থনীতিবিদ এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে যে বাংলাদেশের স্বপ্নচিত্র এঁকেছিলেন তার বাস্তবায়নে আর কি কি করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: আমরা কতগুলো ফাইন্যান্সিয়াল এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছি। কিন্তু আমি বলবো যে, ডেভেলপমেন্ট এর সুফলগুলো যেন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়। কিন্তু আনফরচুনেটলি পৌঁছায় না। এটা আটকে আছে কিছু লোকের জায়গায়, কিছু লোক এটাকে কুক্ষিগত করেছে। অতএব অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়নের ফলগুলো যেন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং এটা পৌঁছাতে হলে জনগণের অংশগ্রহণ লাগবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে যাতে কোনো দুর্নীতি না হয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে সেজন্য এই অংশগ্রহণ। জনগণ যদি মনে করে সরকারের কোনো কাজের সাথে তার কোনো স্বার্থ জড়িত নাই বা উক্ত কাজের দ্বারা তার কোনো উপকার হবে না তখন তারা এগুলো সম্পর্কে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না এবং সজাগ থাকে না।

প্রত্যয়: আপনি পিকেএসএফ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে তিনটি বিশাল দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর থাকাকালীন আত্মজীবনীমূলক একটি চমৎকার গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। পিকেএসএফ এবং এনজিও ব্যুরোতে থাকাকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে কি আপনি আর কোনো আত্মকথা লিখবেন?

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ: আমাকে অনেকেই দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। আমি হয়তো সেখানে এনজিও উন্নয়ন বিষয়ে ফোকাস করবো। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক, মুদ্রানীতি, ব্যাংকিং খাত এবং সুষম ও সমতাভিত্তিক উন্নয়নের ব্যাপারে কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা আছে।■

রাজনীতি না করেও দেশের জন্য কাজ করা যায়

আবদুল হামিদ ভূঁইয়া, প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিসেস (SSS), টাঙ্গাইল

দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অন্যতম প্রতিষ্ঠান সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিসেস (SSS) এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক আলোকিত উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব আবদুল হামিদ ভূঁইয়ার জন্ম ১৯৪৮ সালের ২৮ জুন টাঙ্গাইল শহরের নিকটবর্তী রসুলপুর গ্রামে। তিনি টাঙ্গাইলের বিবেকানন্দ হাই স্কুল থেকে এসএসসি, সা'দত কলেজ থেকে এইচএসসি ও বিএসসি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত নিজগ্রাম রসুলপুর বাসিরুন নেসা হাই স্কুলে শিক্ষকতা (অনারারী) করেন। ১৯৭৯-১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি ASA এর উপপরিচালক ও ১৯৮৩ থেকে '৯৮৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা আহসানিয়া মিশনের উপপরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

ঢাকা আহসানিয়া মিশনে থাকাকালীন সময়েই তিনি এ ধরনের একটি উন্নয়ন সংগঠন প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা করেন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও বিচার নিশ্চয়তার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে এসএসএস প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এসএসএস ৪৫৩টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৪৩ জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও শিক্ষা কার্যক্রমে অভাবনীয় অবদান রাখাসহ টাঙ্গাইলের নিষিদ্ধ পল্লীর সন্তানদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও উন্নতমান জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এ ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানটি অসচ্ছল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবছর ২ কোটি টাকার অধিক বৃত্তি প্রদান করে।

কর্মসুবাদে তিনি ভারত, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, কানাডা, ইউএসএ, কেনিয়া, মরিশাস, ফিলিপিন্স, চায়নাসহ অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৭ সালে প্রাইম মিনিস্টারস ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড, হাতেম আলী খান গোল্ড মেডেল, অ্যাক্রিডিটেশন পভার্টি অ্যালিভিয়েশন অ্যান্ড স্যোসিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পদক, সিটি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক দ্য বেস্ট মাইক্রোফিন্যান্স ইনস্টিটিউশন অ্যাওয়ার্ড ২০০৮ এবং দ্য মোস্ট ইনোভেটিভ মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট অ্যাওয়ার্ড ২০১৩ লাভ করেন।

তিনি একই সাথে POPI (পপি), গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা এবং বিকাশ উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারপার্সন এবং ঢাকা আহসানিয়া মিশনের বোর্ড সদস্য। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে টাঙ্গাইলে ২০১৫ সালে এসএসএস পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল, ১৯৯৯ সালে এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম, ১৯৯৯ সালে এডুকেশন সেন্টার ফর ডোমেস্টিক ওয়ার্কিং চিলড্রেন (১০টি সেন্টার), ২০১১ সালে এসএসএস ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং এবং এসএসএস বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম কারিগর এসএসএস এর নির্বাহী পরিচালক আবদুল হামিদ ভূঁইয়া প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : এসএসএস দেশের এনজিও/এমএফআই খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। দারিদ্র্য নিরসনসহ আপনারা সামাজিক উন্নয়নের অনেক খাতেই কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা এ বছর স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি। এই মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসন কতোটা সম্ভব হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

আবদুল হামিদ ভুঁইয়া : দারিদ্র্য নিরসন যে একেবারে হয়নি তা বলবো না। তবে তা আশানুরূপ হয়নি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এসেছে এটা ঠিক। কিন্তু তাদের এই উন্নয়ন এখনও টেকসই নয়। ঈদ, পূজা, বড়দিনে প্রায় প্রতিটি মানুষকেই অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়– এই ব্যয় করতে হয় সারা বছরের আয় করা জমানো টাকা থেকে। ফলে আবার তার অবস্থা পূর্বের অবস্থায় চলে আসে। দুয়েকজনের হয়তো সঞ্চয় থাকে তা ব্যতিক্রম। কিন্তু সবারই টাকা ব্যয় হয়ে যায়। এতে কি বলা যায় তাদের পরিবর্তন ঘটেছে?

আরেকটি বিষয় যে, প্রায় প্রতিটি মানুষকে আমরা ঋণী বানিয়ে ফেলেছি। পাগল, শিশু, অশীতিপর বৃদ্ধ ছাড়া সবাই কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের ঋণ গ্রহীতা। এটা শুভ না অশুভ বলুন? আমি মনে করি ৫০ বছরে আমাদের অনেক উন্নয়ন হয়েছে, তবে কিছু সমস্যাও সৃষ্টি হয়েছে।

প্রত্যয় : কিন্তু এটাতো ঠিক গ্রাম পর্যায়ে যদি মূল্যায়ন করি তা হলে দেখা যায় যে, অনেক দরিদ্র মানুষ এখন আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছে, কুঁড়েঘর টিনের ঘর হয়েছে, বিল্ডিং হয়েছে তা হলে সমস্যা কোথায়?

আবদুল হামিদ ভুঁইয়া : এই যে উন্নয়নের প্রসঙ্গে বললেন এটি একদম অস্থায়ী। অসংখ্য দরিদ্র মানুষের আর্থিক অবস্থার হয়তো উন্নতি হয়েছে ঠিক, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেরই মনুষ্যত্ববোধের অবলোপন ঘটেছে। আর যার মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ নেই সে তো মানুষই নয়। আমরা যে উন্নয়নে সহযোগিতা করেছি তা হচ্ছে তার ঘরবাড়ির উন্নয়ন হয়েছে, পোশাকের পরিবর্তন হয়েছে, খাবার-দাবার উন্নত হয়েছে, সন্তানরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে– কিন্তু প্রকৃত মানুষ হয়নি তা হলে লাভ কি হলো?

প্রত্যয় : আপনি কি মনে করেন, এর পেছনে শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে ইংরেজ আমলের তোষামোদী কেরানি হবার শিক্ষা দায়ী?

আবদুল হামিদ ভুঁইয়া : দেখুন, ইংরেজ আমলে আমার জন্ম হয়নি। পাকিস্তান আমলে দেখেছি শোষণ নির্যাতনের নানা ঘটনা। তাদের প্রতিরোধ করা যায়নি। যারা প্রতিরোধ করেছে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে। তবে আপনার মূল প্রশ্নের উত্তরে বলবো এই দেশকে নিয়ে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই এখানকার নেতৃত্ব বিষয়ে বলতে হয়। এর দুটো অংশ। একটা হচ্ছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত, আরেকটি যুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন দেশের নেতৃত্ব। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত নেতৃত্বের দিক-নির্দেশনা বেশ সঠিক থাকলেও স্বাধীনতার পর আশানুরূপ নেতৃত্ব পাওয়া যায়নি। আমি মনে করি একটি জাতির মানসিক ও মানবিক উন্নয়নের জন্য সুযোগ্য নেতৃত্বের বড় প্রয়োজন।

প্রত্যয় : এটাতো ঠিক স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে অনেক মানুষকেই অনাহারে মরতে হতো এখন তা ঘটে না–

আবদুল হামিদ ভুঁইয়া : মানুষ অনাহারে নেই এটাই উন্নয়নের মাপকাঠি নয়। দেখার বিষয় যে, আগে না খেয়ে মরতো আর এখন অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে অসংখ্য মানুষ নানা রোগে ভুগে মারা যাচ্ছে। আগের মানুষ ভেজাল দিতো না এখন আমরা খাদ্যে ভেজাল দেই। ভেজালের কারণে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে প্রতিনিয়ত: অসংখ্য মানুষের জীবন নাশের ঘটনা ঘটছে আমরা তা অনুধাবন করছি না।

প্রত্যয় : আপনি এসএসএস এর প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক। এটি গড়ে তোলার কাহিনি যদি বলেন?

আবদুল হামিদ ভুঁইয়া : আমি তখন ঢাকা আহসানিয়া মিশনে চাকরি করি। সে সময় বন্যা হয়, আমি রিলিফের কাজ করি। বন্যায় মানিকগঞ্জসহ বিভিন্ন জায়গায় মিশনের মাধ্যমে ত্রাণ দেই। একবার টাঙ্গাইল আসি– দেখি এখানেও অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু আহসানিয়া মিশনের শাখা না থাকায় কোনো সহযোগিতাই করতে পারছি না। তখন মনে হলো দূরে দূরে সাহায্য দিচ্ছি আর আমার জন্মভূমি এলাকার মানুষকে দিতে পারছি না। ভাবলাম কিছু একটা করা দরকার। এবং বলতে কি ঢাকা আহসানিয়া মিশনে থেকেই আমি এসএসএস এর কার্যক্রম শুরু করি। আমার সাথে আরো দুজন ছিল। সেটা ছিল ১৯৮৬ এর বন্যার পরে। আমরা রেজিস্ট্রেশন পাই ৯০ এর জানুয়ারিতে। আমার অভিজ্ঞতাও খুব বেশি ছিল না। এর আগে আমি 'আশা'তেও কাজ করেছি। আশারও শুরু, আমারও শুরু। ওখানে ১৯৭৯ সালে ছিলাম। মানিকগঞ্জের শিবালয় থানায় যখন আশার শুরু হয় তখন এখানে আমি একাই কর্মরত ছিলাম। আমাকে বেতন দিত ৪০০ টাকা। ওখানে পেঁয়াজের মার্কেট আছে, একটা কলেজও আছে। স্টাফ আমি একাই। ঘর ঝাড়ু দেবো কি ঘরও ছিল না। ক্লাসের একটা অংশ চেয়ে নিলাম। একটা চেয়ার ও একটা টেবিল তাদের। আশার প্রতিষ্ঠাতা সফিকুল হক চৌধুরী তখন সিসিলিতে চাকরি করতেন। ওখানে তাদের একটা প্রজেক্ট ছিল। ঐ কারণেই ওখানে আশার শুরু। আশার সম্বল বলতে একটা কমিটি ও আমি একজন মাত্র স্টাফ; একটা আলমারি আর ১৫ হাজার টাকা ছিল। আমি ৮১ সাল পর্যন্ত ওখানে কাজ করেছি। ছাত্রজীবনে লাল বই পড়ে মনমানসিকতা ছিল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করতে হবে, এদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে হবে। সুতরাং আমি মনে করলাম এই কাজটিই এর জন্য উপযুক্ত।

এরপর অসুস্থ ছিলাম কয়েক বছর। ১৯৮৫ সালে আবার আহসানিয়া মিশনে যোগদান করি। ৯০ সাল পর্যন্ত ছিলাম। বলতে গেলে আহসানিয়া মিশনই এসএসএস এর আঁতুর ঘর। আমি ঢাকায় বসে কাগজপত্র তৈরি করেছি। এখানে দু'তিন জন ভলান্টিয়ার কাজ করেছে– কোনো অফিস ছিল

এসএসএস পৌর আইডিয়াল হাই স্কুলে নিম্ন বর্ণের ছেলেমেয়েরাও পড়ার সুযোগ পায়

না। বেতন দিতে পারিনি। আমরা সমিতি গড়ে তুলি। সমিতির সদস্যরা বছর শেষে নিজেরা চাল-ডাল দিয়ে পিকনিক করতো। একত্রিত হয়ে আনন্দ করতো। চমৎকার বন্ডিং ছিল। তখন কোনো সদস্যের ঋণ বকেয়া পড়তো না। তাদের ভাবনা ছিল যে করেই হোক সংস্থার কাজকে ঠিক রাখতে হবে। কেউ দিতে পারছে না ৫ জন মিলে দিয়ে দিতো। একটা চমৎকার পরিবেশ ছিল সদস্যদের সঞ্চয় ছিল মাত্র ২ টাকা। আর ঋণ ছিল ১০০০ টাকার মধ্যে। ৬শ' থেকে ৯শ' সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা। তখন তো এতো অর্থ ছিল না। এরপর দেয়া হতো ২ হাজার টাকা ঋণ। আমাদের ঋণ কার্যক্রমের শুরুই হয়েছিল সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে।

প্রত্যয় : আপনারা তখন কি বাইরের ফান্ড বা পিকেএসএফ এর ফান্ড নিয়ে কার্যক্রম করতেন?

আবদুল হামিদ ভূঁইয়া : না, তখন পিকেএসএফ এর জন্ম হয়নি। সে সময় নারায়ণগঞ্জে ক্রিশ্চিয়ানদের একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। বার্টিন গোমেজ চাকরি করতেন হংকং এর এপিএইচডি নামের একটা অর্গানাইজেশনে। ওনার সাথে চাকরি করতো আমাদের একজন সাধন বাবুর স্ত্রী। তার মাধ্যমে কথা বলে একটা চিঠি দিলাম। তারা আমাদের ফান্ড চেয়ে চিঠি দিতে বললে দিই। ১৯৮৯ সালে তারা আমাদের প্রপোজালের বিপরীতে প্রায় ১০ লাখ টাকা ফান্ড প্রদান করে। ৩ বছরের জন্য ১৯ লাখ ৩৫ হাজার টাকা অনুমোদন পাই। এই ডোনেশনের পর আমরা সবলভাবে পথ চলার সুযোগ পেলাম। কারিতাস বাংলাদেশ আমাদের কাজের মনিটরিং করতো। আমরা তখন ১ টাকাকে ফাইভ টাইমস ব্যবহার করে ৫ টাকার কাজ করতাম।

আমি এখন যে টেবিলে বসে কাজ করছি তা সেই ৮৯ সালে তৈরি করা, তখন এটি ১২০০ টাকা দিয়ে করিয়েছিলাম। আমি এই টেবিল ছাড়িনি। কাঠ, সুতার সবই ছিল বাকি। চেক পেয়ে তারপর তাদের টাকা পরিশোধ করি। ফান্ড খরচের বিষয়ে এবং অফিস দেখার জন্য তদন্তে এসে তদন্ত কর্মকর্তারা বললেন, আপনারা এত ফার্নিচার করার টাকা কোথায় পেলেন? বললাম বাজেটে যা আছে তাই দিয়ে একটার বদলে দুটো করেছি। জানালো এই রিপোর্ট দিলে আপনারা আর ফান্ড পাবেন না। বললাম, ঠিক আছে রিপোর্ট দিন। তাদের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে হংকং থেকে আমাদের কাজের প্রশংসা করে চিঠি এলো। তারা জানালো, আমরা এটাই চাই। তোমরা ফান্ডের মধ্যে থেকেই একটার টাকায় দুটো করেছ।

এরপর ট্রেনিংয়ের জন্য টাকা এলো। কর্মীদের নগদ দেয়ার জন্য বলা হলো। সেই টাকায় হাড়ি পাতিল এবং বিছানাপত্র কিনে অফিসেই থাকা এবং খাবার ব্যবস্থা করা হলো। ট্রেনিং শেষে আবার তাদের ১০টা করে মুরগি ও ১টা মোরগসহ নগদ ১০০ টাকা করে দিয়ে দিলাম। তারা বেশ খুশি। ট্রেনিংয়ের টাকা থেকে যে টাকা বেঁচে গেল তা দিয়ে দুটো মটর সাইকেল কিনি। এভাবেই শুরু হলো যাত্রা। অনেকটা কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলা।

কর্মী সংখ্যা ১১ জন, বেতন ৭ জনের। ডোনারের কাছে লিখলাম তোমাদের দেয়া ৭ জনের বেতন দিয়ে ১১ জনের মধ্যে ভাগ করে নিতে চাই। তারা সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিল। আল্লাহর রহমতে কোনো কাজে ফেল করিনি। আমরা যে হাসপাতাল করেছি তা নেদারল্যান্ডের একটা এজেন্সির কাজ করে দেয়ার উদ্বৃত্ত টাকায়। এসএসএস এই পর্যায়ে উঠে আসা–এটা আমাদের পরিশ্রমের ফসল। আমরা ডোনারদের থেকেও খুব একটা নেইনি। আল্লাহর রহমতে এতোদূর এসেছি।

আমরা সে সময় বেশিরভাগই রাতে কাজ করতাম। বিশেষ করে উঠোন বৈঠকে সদস্যদের সচেতন করতাম। আমি যেহেতু বাম ধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম, তখন সদস্যদের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথাও বলতাম। শুরুতে পুরুষের সংখ্যা বেশি ছিল পরে নারীরাও সদস্য হয়। সদস্যরা মুষ্ঠির চাল উঠাতো তা বিক্রি করে আবার সদস্যদের মধ্যে ঋণও দেয়া হতো। অর্থাৎ প্রথম থেকেই আমরা স্বনির্ভর থাকার চিন্তা করেছি। '৯০ এর শেষের দিকে আমরা নেদারল্যান্ডস এবং অস্ট্রেলিয়ার ডোনার পেলাম। ছোট ছোট ফান্ড। আমরা পুঁজি ভেঙে কাজ করিনি। আয় করে খরচ করেছি।

প্রত্যয় : এখন এসএসএস এর আয়ের উৎস কি?

আবদুল হামিদ ভূঁইয়া : সার্ভিস চার্জই আমাদের আয়ের উৎস। ইতোমধ্যেই আমরা ফরেন ডোনেশন থেকে বেরিয়ে এসেছি। এবার পিকেএসএফ এর ফান্ড থেকেও বেরোতে পারব ইনশাআল্লাহ। তবে এখন জিরো থেকে প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো অনেক কঠিন হবে।

প্রত্যয় : আপনারা কি কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছেন?

আবদুল হামিদ ভূঁইয়া : আমরাও নিচ্ছি। বুরো বাংলাদেশ আগে থেকেই নিচ্ছে। আমরাও শুরু করেছি।

প্রত্যয় : আপনার কি মনে হয় ব্যাংকগুলো এনজিওবান্ধব?

আবদুল হামিদ ভূঁইয়া : দেখুন, ব্যাংকগুলোর অব্যবহৃত প্রচুর অলস ফান্ড রয়েছে। এখন তারা ব্যবসায়ীদের দিতে পারছে না। অব্যবহৃত অর্থ বেশি থাকলে তাদের ক্ষতি। এ জন্য তারা এখন এনজিওদের ঋণ দিচ্ছে। যে টাকা তাদের কয়েকশ জনকে দিতে হতো তা তারা এক জায়গায় ইনভেস্ট করছে এবং এটি তাদের জন্য নিরাপদ বিনিয়োগ। রিস্ক আমাদের, তাদের কোনো ক্ষতি নেই। যদি তারা বেশি লাভে অন্যত্র টাকা খাটাতে পারে তা হলে এনজিও/এমএফআইদের এখনকার সুদে টাকা দেবে? দেবে না। এখন তারা নিয়মিত কিস্তির টাকা পাচ্ছে ঘুরতে হয় না। একজনকে দিয়েই যোগাযোগ রাখতে পারছে। আর যদি শত শত মানুষকে এই টাকা ঋণ দিতে হতো তাহলে তাদের লোকবল বেশি লাগতো আবার ব্যয়ও হতো বেশি।

প্রত্যয় : আপনি এনজিও খাতে একটি ভিন্নমাত্রিক কার্যক্রম 'নিষিদ্ধ পল্লী'র নারীদের সন্তানদের শিক্ষা ও আশ্রয় নিয়ে কাজ করছেন। এ ধরনের একটি উদ্যোগের পটভূমি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি–

আবদুল হামিদ ভূঁইয়া : আমি তখনও এনজিওর সাথে সম্পৃক্ত হইনি। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় নিষিদ্ধ পল্লীর ওপর একটি প্রতিবেদন দেখে তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমার আগ্রহ জন্মে। কিন্তু কীভাবে যাবো? একটা পরিচিত ছেলে পেলাম ওখানকার রাস্তাঘাট চেনা– ওকে নিয়ে গেলাম। এক মহিলার সাথে আধা ঘণ্টা কথা বলি তিনি আমাদের চা খাওয়ান। অনেকক্ষণ সময় নেয়ার কারণে যেহেতু তার ব্যবসার ক্ষতি করলাম সে

জন্য ২০ টাকা দিই, সে টাকা নিল না তার চোখে পানি। এটি ৭৭-৭৮ সালের কথা। বললো, আমরা খুব বিপদে আছি। যদি কখনো সুযোগ পান আমাদের জন্য কিছু করবেন। সে মুহূর্তেই আমার চিন্তা হলো তারাও তো মানুষ– এদের জন্য কিছু করা উচিত।

এর ১৭/১৮ বছর পর ৯০ দশকে এসে সুযোগ পেলাম কিছু করার। তখন এখানে প্রায় ১ হাজার জন কর্মক্ষম মহিলা ছিল। তাদের অনেক সন্তান। বাচ্চাদের জন্য কাজ শুরু করলাম। তখন এখানে সেভ দ্য চিলড্রেন অর্গানাইজেশন ছিল। তাদের ২টা শেল্টার হোম ছিল পথ শিশুদের জন্য। পোলাপান যারা রাস্তায় ঘুরতো ফিরতো তাদের এখানে নিয়ে আসতাম। গোসল করার সুবিধা ছিল। প্রথম দিকে খাবার দেইনি। পরে খাবার দিয়েছি, ঘুমানোর সুযোগ দিয়েছি, ইনডোর খেলার জন্য কেরাম বোর্ড, লুডু কিনে দিয়েছি। আর ফাঁকে ফাঁকে তাদের পড়ার ব্যবস্থা করেছি। দুই জায়গায় প্রায় ৬০ জন করে ১২০/১২৫ জন ছিল। মাসখানেক পর দেখলাম ওদের সংখ্যা কমে গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখলাম কিছু ছিল যৌন পল্লীর বাচ্চা আর কিছু পিতৃপরিচয়হীন বাচ্চা– ওরা দুই দল হয়ে যায়। একদল বলে, আমরা যৌনকর্মীদের সন্তানদের সাথে থাকবো না। সমস্যা সমাধানে আমরা যৌন পল্লীর কাছেই একটা পরিত্যক্ত মাঠ ছিল– সেখানে আম গাছের নিচে প্রথমে ওদের ৬০ জন ছেলেমেয়ে নিয়ে শুরু করি। আমাদের একজন শিক্ষক ওদের পড়াতো, বইপত্র ট্রাঙ্কে নিয়ে যেতো। রোদ বৃষ্টিতে বন্ধ রাখতে হয়। প্রতিদিন ট্রাঙ্ক রিকশায় আনা-নেয়া করতে হতো। পরে এক দোকানদার ৫ ওয়াক্ত নামাজি– তিনি তার দোকানে ট্রাঙ্ক রাখার সুযোগ দিলেন। দুপুরে ওদের নাস্তা দিতাম। লক্ষ্য করলাম, ওরা খুব মনোযোগী হচ্ছে না। ফুরসৎ পেলেই দৌড়ে চলে যায়। আবার এদের মধ্যে কিছু ছিল চালাক। অনেক খদ্দের ভেতরে ঢোকার আগে টাকা-পয়সা রাস্তার মাটির নিচে রেখে যেতো। এটা খেয়াল রেখে ওরা সেই টাকা তুলে নিয়ে মজা-টজা কিনে খেতো। তখন আমরা কোদালিয়া, নতুন বাস স্ট্যান্ডের পূর্ব পাশে এক পুলিশ অফিসারের বাসা ভাড়া নিলাম। প্রথমে ৮ জন দিয়ে চালু করা হলো। অপপ্রচার চালানো হলো আমরা শিশু পাচার করব। ওদের রক্ত বিক্রি করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন আমি ওদের মা'দের দাওয়াত দেই দেখে যাওয়ার জন্য।

তখন আবার আরেক সমস্যা– এলাকা থেকে আপত্তি উঠলো নিষিদ্ধ পল্লীর মহিলারা এখানে আসে, পরিবেশ নষ্ট হবে। মায়েদের বোরকা পড়ে আসতে বলা হলো। ওরা আশ্বস্ত হলো যে সন্তানরা ঠিক আছে। সকালে আরবি পড়ানোর হুজুর রাখলাম। নামাজ শিখালাম। ৪০ জন হলো। কাছেই ছিল প্রাইমারি স্কুল-মসজিদ। হুজুরকে দিয়ে সেখানে প্রতি সপ্তাহেই মিলাদ পড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া হলো। প্রথমে মসজিদেও ঢুকতে দেয়নি ওদের। পরে এক হুজুর সুযোগ করে দিল। এদিকে এই বাচ্চারা শাক খায় না, ছোট মাছ খায় না। কি ব্যাপার? জানলাম, মায়েরা ওদের বিরানির টাকা দিত অধিকাংশ দিন। পোলাও মাংস খেতো। এই স্বাভাবিক খাবার শেখাতেও বেশ সময় লেগেছে। মসজিদে মিলাদ পড়াই, মসজিদের উন্নয়নে কিছু সাহায্যও করি– তখন এতো অর্থ ছিল না। এই উদ্যোগকে এলাকার লোকও পছন্দ করতে শুরু করলো।

ওদের জন্য খাট-বিছানার ব্যবস্থা করা হলো। ওরা খাটে না শুয়ে খাটের নিচে শুয়ে থাকতো। ওখানে তো খাটের নিচে শুতে হতো। এটা শেখাতেও সময় লেগেছে। মসজিদে নামাজ, প্রাইমারি স্কুলে বাংলা শেখানো হতো। এরপর আমরা আইএলওর ফান্ড পেলাম। এক ভদ্রলোক আমাদের কাজ দেখে ২৪ লাখ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করলেন। ওটা এক বছর চললো। উনি বদলি হয়ে যাওয়ায় আর পাইনি। ২৪ লাখ টাকায় টাঙ্গাইল শহর থেকে একটু দূরে জমি ক্রয় করি। সেখানে এখন তাদের থাকা ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রত্যয় : আপনার সহকর্মীদের মধ্যে ওদের নিয়ে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখেছেন কি?

আবদুল হামিদ ভূঁইয়া : এমন ঘটনাও ঘটেছে। একবার যৌন পল্লীর ৪০ জন মাকে আমাদের অফিসে মিটিংয়ে ডাকি। তাদের চা নাস্তা করাই। পরদিন আমার অফিসের লোকেরা সেই কাপে চা খাবে না বলে জানায়। বলুন কি অবস্থা। পরে তাদের মাইন্ড সেটআপ করি। বলি মানুষ হিসেবে তারা কি আলাদা? পরবর্তীতে এই স্টাফরা যৌন পল্লীতে তাদের ঘরে দাওয়াতও খেয়েছে।

অনেক ঘটনা অনেক কাহিনি রয়েছে। আমাদের কাছে জায়গা বিক্রি করা নিয়েও অনেকে আপত্তি করেছে। পরে কুচবাড়িতে ১২ বিঘা জাগয়া পাই। রাস্তা ছিল না। এখন ২৭ বিঘা। কাজ শুরুর পর এলাকার অনেকেই বাধা দিয়েছে এলাকা নষ্ট হয়ে যাবে বলে। তাদের বুঝাতে দেন-দরবার করতে হয়েছে। এলাকার লোকজনকে মিলাদের দাওয়াতসহ উপলক্ষ্য ছাড়াই দাওয়াত খাইয়েছি। শুক্রবারে আমাদের ছেলেদের মসজিদে যেতে দিত না, তারপর আমি এক দিন নামাজ পড়তে গেলাম। ইমাম সাহেবকে বললাম ঘরটা খুব পুরনো, বৃষ্টিতে পানি পড়ে। নতুন টিন কিনে দিলাম। আমাদের ছেলেদের নামাজ পড়ার সুযোগ হলো। পরে আদর করেও মসজিদে নিতো।

টাঙ্গাইলের কুইচবাড়িতে এসওএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোমে অবস্থানরত আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের কয়েকজন।

স্কুল কম্পাউন্ডের ভেতরে হলেও একটু বেরুলেই মেয়েদের উত্যক্ত করতো এলাকার কিছু তরুণ। মাঝে মাঝে শালিসও ডাকতে হয়। তখন মার্শাল আর্টের শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে ছেলেমেয়েদের মার্শাল আর্ট শেখানো শুরু করলাম। তখন কেউ উত্যাক্ত করলে ছেলেমেয়েরা তাদের পিটাতো। এ নিয়েও সমস্যা। স্থানীয় চেয়ারম্যানের ছেলে এলাকায় আমাদের এক মেয়ের কাছে পিটুনি খেলো। পরে তার মীমাংসা করি। এরকম ঝামেলাও পোহাতে হয়।

প্রত্যয় : আপনাদের স্কুলে পড়ার পর তারা আর কোথায় পড়ার সুযোগ পায়? অধ্যয়ন শেষে আপনারা কি তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিচ্ছেন?

আবদুল হামিদ ভুঁইয়া : কুইচবাড়ি প্রাইমারি স্কুল ও মগড়া হাইস্কুল আছে। সেখানে পড়ার সুযোগ পায়। আর পাস করার পর যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির ব্যবস্থাও করা হয়। আমাদের ১ জন মেয়ে ইতোমধ্যে এসএসএস এর শাখা ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করছেন। বেশ কজন অনার্সে পড়ছে। কৃষিতেও পড়ছে। একজন ডিপ্লোমা কৃষিবিদসহ অন্যান্য পোস্টে বেশ কজন চাকরি করছে। নার্সিং শিক্ষা নিয়ে সরকারি চাকরিও করছে আবার আমাদের হাসপাতালেও কয়েকজন কাজ করছে। ছেলেদের মধ্যে ড্রাইভার, রাজমিস্ত্রির কাজ করছে কয়েকজন। এখন ৭৮ জন ছাত্রছাত্রী আছে। ১৭ জনকে বিয়ে দিয়েছি। আরো কয়েকজনের বিয়ের সময় হয়েছে।

এসএসএস পৌর আইডিয়াল হাই স্কুলে চলছে সাংস্কৃতিক চর্চা

প্রত্যয় : মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে যৌতুক দিতে হচ্ছে কি?

আবদুল হামিদ ভুঁইয়া : যারা বিয়ে করছেন তারা সব কিছু জেনেই করছেন। আমরা কোনো কিছুই গোপন করছি না। যৌতুক দিতে হয়নি। প্রতিষ্ঠান থেকেই অনুষ্ঠান করে বিয়ে দেয়া হয়েছে। বাবার নাম হিসেবে প্রথম প্রথম আমার নাম ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের মায়েদের কাছ থেকেও বাবার নাম জেনে নিচ্ছি।

প্রত্যয় : দেশে এনজিও সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের নেটওয়ার্ক এখন ব্যাপক। আপনারা ক্ষুদ্র অর্থায়ন, কৃষিঋণ, মোবাইল ব্যাংকিং, রেমিট্যান্সসহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমেও ভূমিকা রাখছেন। এনজিও/এমএফআইদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাচ্ছি।

আবদুল হামিদ ভুঁইয়া : এটা ঠিক যে স্বাধীনতার পর যে এনজিও সেক্টরের জন্ম হয়েছিল শুধু দরিদ্র মানুষদের পুনর্বাসন ও ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কালের পরিক্রমায় সেই সেক্টরটি এখন অনেক ধরনের আর্থ-সামাজিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠী না থাকলে এনজিওদেরও কোনো কাজ থাকবে না, আমি তা মনে করি না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে এনজিওদের কাজেরও পরিবর্তন আসবে। মূল কথা, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থারও প্রয়োজন থাকবেই।

প্রত্যয় : আপনারা স্বাস্থ্য খাতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন– এই কার্যক্রম দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কি?

আবদুল হামিদ ভুঁইয়া : দেখুন, নিজেদের সক্ষমতা বিবেচনা করে উদ্যোগ নিতে হবে। এই পৃথিবীতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দুটো বিষয়ই অধিক ব্যয়বহুল। কম্প্রোমাইজ করার কোনো সুযোগ নেই। আমরা যা করছি তা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে হেলথকেয়ারের কাজ করছি। এই কাজ করতে গিয়ে প্রতি মাসে ১৪/১৫ লাখ টাকা ভর্তুকি গুনছি। স্বাস্থ্য খাতে লাভজনকভাবে কিছু করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধতা নিয়েও যতটুকু পারছি স্বাস্থ্যসেবা করছি।

টাঙ্গাইল সরকারি হাসপাতালের কথাই ধরুন। করোনাকালে আপনাদের মতো আমরাও তাদের যন্ত্রপাতি দিয়েছি। প্রায় ১৫ লাখ টাকার সাপোর্ট দিয়েছি। সরকারই যেখানে নিজস্ব অর্থায়নে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারছে না সেখানে আমরা দেশব্যাপী কীভাবে পারব? চিন্তা করলেই তো আর হবে না। কোনো এনজিও যদি মনে করে দেশব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা কিংবা শিক্ষা সহায়তা দেবে তা সম্ভব হবে না। তবে কিছু সহায়তা করা যায়।

প্রত্যয় : ইতোমধ্যে এনজিও/এমএফআই এর উদ্যোগী ভূমিকা ও ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে যাদের আরো অর্থায়ন প্রয়োজন। দেশের ব্যাংকগুলো এখন পর্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছুতে পারেনি যেখানে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। সেক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সক্ষম ও আস্থাভাজন এমএফআইসমূহকে কি প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে লাইসেন্স দেয়া যায় বলে আপনি মনে করেন?

আবদুল হামিদ ভুঁইয়া : আমি মনে করি, আমাদের কাছে মানুষের অর্থ সম্পদ নিরাপদ। আমরা এখন ক্ষুদ্র আকারে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করছি। এই উদ্যোক্তাদের এখনই অধিক অর্থের প্রয়োজন হচ্ছে কিন্তু আমরা তা দিতে পারছি না। একটি বিষয় বাস্তব যে, একসময় গ্রামীণ দরিদ্রদের আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হতে খুব বেশি টাকার প্রয়োজন হতো না। অল্প টাকাতেই তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও আত্মকর্মসংস্থান করতে পারতো। এখন সে অবস্থা নেই। তাদের বেশি টাকা প্রয়োজন হচ্ছে। দেশের ব্যাংকগুলো ঋণ দিলেও সবখানে তাদের ঋণ প্রদানের সুযোগ নেই। ব্যাংকের বিকল্প হিসেবেই মানুষ এনজিওদের কাছে আসে। টাকা জমা করে ঋণ নেয়। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি আর্থিকভাবে সক্ষম ও আস্থাভাজন এমএফআইদের জন্য একটি ব্যাংকের ব্যবস্থা সরকার করতে পারে। যেখানে একাধিক এনজিও/এমএফআই সম্মিলিতভাবে ব্যাংক গঠন করে আমাদের উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করবে।

প্রত্যয় : আপনি কি কখনো রাজনীতি করার চিন্তা ভাবনা করছেন?

আবদুল হামিদ ভুঁইয়া : এনজিও সেক্টরে আমরা যারা কাজ করি তাদের রাজনীতি করা উচিত নয়। রাজনৈতিক কারণেই প্রশিকার মতো বৃহৎ একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং রাজনীতি করার লোভ আমার নেই। রাজনীতি না করেও দেশের কাজ করা যায় এবং জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন করা যায়। তার বড় উদাহরণ এনজিও/এমএফআই সেক্টর।■

সাজেদা ফাউন্ডেশন। ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও স্বাস্থ্যসেবায় অনন্য

এই নিকট অতীতেও বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ ছিল দরিদ্র ও হতদরিদ্র। এ সকল দরিদ্র মানুষদের সার্বিক উন্নয়নে এ দেশেরই কিছু উন্নয়ন চিন্তার মানুষ উদ্যোগী হন। তাদেরই একজন সৈয়দ হুমায়ুন কবির। মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ এই মানুষটি খুবই ক্ষুদ্র আকারে ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন সাজেদা ফাউন্ডেশন। তিনি তার গ্যারেজে শিক্ষাবঞ্চিত দরিদ্র শিশুদের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক একটি স্কুল চালু করেন। তিনি ছিলেন বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি pfizer এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। pfizer Inc. New York এদেশে ১৯৭২ সালে যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৩ সালে বিদেশি কর্তৃপক্ষ এ কোম্পানির শেয়ার বাংলাদেশের স্থানীয় শেয়ার হোল্ডারদের নিকট ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলে সৈয়দ হুমায়ুন কবির Renata Ltd. প্রতিষ্ঠা করে সেই শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করেন। মানবদরদী কবির দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কোম্পানির ৫১% শেয়ার সাজেদা ফাউন্ডেশনকে প্রদান করেন। উল্লেখ্য, রেনাটা লিমিটেড দেশের চতুর্থ বৃহত্তম ফার্মাসিউটিক্যালস প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের ওষুধ সামগ্রী যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ১৫টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

এর ফলেই সাজেদা ফাউন্ডেশন ছোট অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে বৃহৎ পরিসরে দারিদ্র্য বিমোচনসহ অনেক ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পায়। বর্তমানে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও স্বাস্থ্যসেবাসহ এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট, সমৃদ্ধি, হোম অ্যান্ড কম্যুনিটি কেয়ার, নারীর ক্ষমতায়ন, ওয়াটার স্যানিটেশন অন্যতম। শহরের ছিন্নমূল দরিদ্র মানুষদের জন্য সাজেদা ফাউন্ডেশন স্বাস্থ্যসম্মত গোসল ও সৌচাগার প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি ২৩ জেলায় ৩১৩৫টি টিমের সাহায্যে ৬ মিলিয়ন মানুষকে সহযোগিতা করছে। বিগত ২৭ বছরে সাজেদা ফাউন্ডেশন তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে এক ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অর্থবহ স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

সাজেদা ফাউন্ডেশন হাসপাতাল

দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অন্যতম প্রতিষ্ঠান সাজেদা ফাউন্ডেশন আর্তমানবতার সেবাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ব্যাপক প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে বিগত করোনা মহামারি মুহূর্তে সাজেদা ফাউন্ডেশনের ডাক্তার ও কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছেন তা সত্যিই বিরল।

কোভিড-১৯ মহামারিকালে সাজেদা ফাউন্ডেশন পরিচালিত নারায়ণগঞ্জের সাজেদা হাসপাতালের সেবা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বিনামূল্যে এই হাসপাতাল ১ হাজারেরও বেশি কোভিড রোগীকে মানসম্মত চিকিৎসাসেবা দিয়ে জনমনে জাগরুক হয়ে আছে। দেশের অন্যান্য

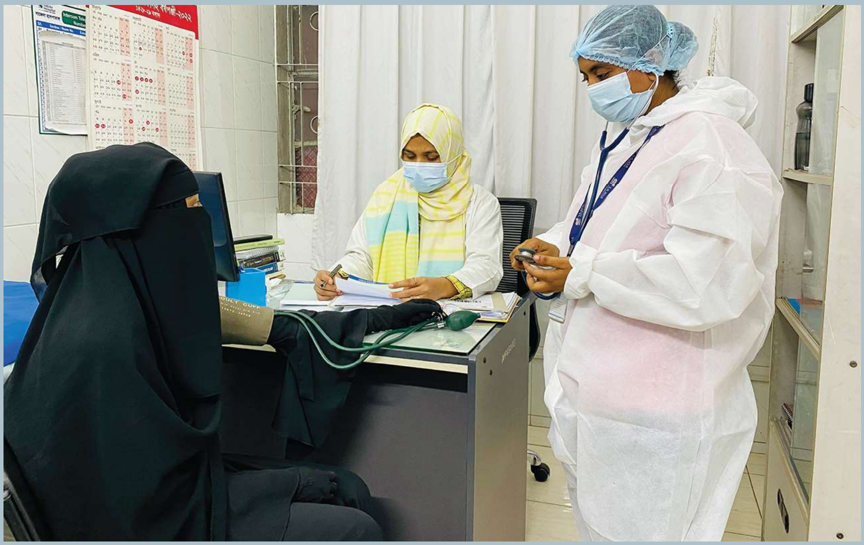

কেরানীগঞ্জে সাজেদা হাসপাতালের সেবা প্রদান

ঢাকা মহানগরীর মানিকনগরে 'আমরাও মানুষ ডে কেয়ার সেন্টারে' শিশুদের অভিভাবক ও কর্মকর্তাদের সাথে প্রত্যয় টিম

হাসপাতালে যেখানে চিকিৎসকরা দূরত্ব বজায় রেখে চিকিৎসা পরিচালনা করেছেন সেখানে সাজেদা হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা ছিলেন ব্যতিক্রম। তারা মানসম্মত পিপিই পরিধান করে সরাসরি হাতের স্পর্শেই রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করতেন। তারা এসব পিপিই প্রতিদিনই বদলাতেন। পরদিন নতুন পিপিই ব্যবহার করতেন। নারায়ণগঞ্জের এই হাসপাতালে দেশের ৮ বিভাগের ৪০ জেলার মানুষ চিকিৎসাসেবা নিয়েছে।

এ বছর থেকে কোভিড-১৯ এর চিকিৎসার জন্য কেরানীগঞ্জ সাজেদা হাসপাতালে আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে ২২টি সেমি ক্রিটিক্যাল শয্যাসহ ৬টি আইসিইউ বেড রাখা হয়েছে।

সাজেদা হাসপাতাল কেরানীগঞ্জ

ঢাকার পার্শ্ববর্তী কেরানীগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে সাজেদা হাসপাতাল অবস্থিত। সাজেদা হাসপাতালে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট (বিশেষজ্ঞ) চিকিৎসকের সংখ্যা ২৯, গ্র্যাজুয়েট ডাক্তারের সংখ্যা ৩২, নার্স এবং প্যারামেডিকস ৭৬ জন। এ হাসপাতালটি ইতোমধ্যে রোগীদের ব্যাপক আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যে এ হাসপাতালের আউটডোরে প্রায় ২০ লাখ রোগী চিকিৎসা গ্রহণ করেছে। আউটডোরের রোগীদের মধ্যে প্রায় ৯২ হাজারের বেশি রোগী এ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। ৫৭৭৮ জনকে সার্জারি অপারেশন করা হয়। ২০২০ সাল নাগাদ এ হাসপাতালে ২১৫০০ জন গর্ভবতী নারীকে সিজারিয়ান অপারেশন ও ৫১৬৫ জনকে নর্মাল ডেলিভারি করানো হয়েছে। উল্লেখ্য, স্থানীয় জনগণের মতে, এ হাসপাতালের কার্যক্রম অন্যান্য হাসপাতালের চেয়ে উন্নতমানের। এ কারণে এখনে প্রতিমুহূর্তে রোগীদের ভিড় লক্ষ্যণীয়।

সাজেদা হাসপাতালের প্রধান এ প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র পরিচালক ডা. তারিকুল ইসলাম জানান, 'আমরা এ হাসপাতালে রোগীদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সেবা প্রদান করি। কারণ, আমরা মনে করি সাজেদা ফাউন্ডেশনের সৃষ্টিই হয়েছে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য। তিনি বলেন, সাজেদা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ হুমায়ুন কবির এর স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা ছিল একটি সুন্দর দারিদ্র্যমুক্ত, হাসিখুশি, সুস্থ-সুন্দর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি সাজেদা ফাউন্ডেশনকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে দিয়ে গেছেন। সাজেদা হাসপাতাল বিগত করোনাকালে নির্মোহভাবে মানুষের সেবা করেছে। তিনি বলেন, আমরা মৃত্যুকে জয় করেই কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলাম। ডা. তারিকুল ইসলাম আরো জানান, স্বাস্থ্য খাতে সাজেদা ফাউন্ডেশন ব্যতিক্রমী ভূমিকা রেখে চলেছে। তিনি বলেন, সাজেদা হাসপাতাল কখনো ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয়, সম্পূর্ণ সেবাধর্মী মানবকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরাও মানুষ ডে কেয়ার সেন্টারে নিশ্চিন্ত মা ও শিশু

আমরাও মানুষ

নগর এলাকার দুস্থ অসহায় দরিদ্র ও অনেকটা আশ্রয়হীন মানুষদের জীবনযাপনে উন্নয়নের ছোঁয়া দিতেই সাজেদা ফাউন্ডেশন 'আমরাও মানুষ' কর্মসূচি চালু করেছে। হতদরিদ্র পরিবারের অনেকেই ঢাকার ফুটপাথে, রেললাইন বা খেলার মাঠের পাশে পলিথিনের ভাসমান ঘর বানিয়ে থাকে। তাদের স্বামীরা কেউ রিকশাচালক, কেউ দিনমজুর আবার কেউ ভ্যানচালক। আর নারীরা কাজ করেন বাসাবাড়িতে। সমস্যার সৃষ্টি হয় তাদের সন্তানদের নিয়ে। সন্তানসহ বাসাবাড়িতে কাজ করার সুযোগ থাকে না। কিন্তু জীবিকা ছাড়া বেঁচে থাকা যায় না। এই সব সর্বহারা দুঃখী মানুষের কথা চিন্তা করেই সাজেদা ফাউন্ডেশন গড়ে তুলেছে 'আমরাও মানুষ' নামের ডে কেয়ার সেন্টার। ঢাকায় ৫টি এবং চট্টগ্রামে ২টি সেন্টার রয়েছে। প্রতি সেন্টারেই ৩০টি পরিবারের ৩০ জন শিশু এই সেন্টারে সারাদিন থাকা, আহার ও পরিচর্যা পাচ্ছে। তাদের পড়াশোনা ও খেলাধুলার ব্যবস্থাও রয়েছে। এর ফলে তাদের মায়েরা

সাজেদা ফাউন্ডেশনের সমৃদ্ধি ঋণে সফল এক নারী

নিরাপদে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। এসব শিশুরা যথেষ্ট উন্নত জীবনযাপনে বড় হচ্ছে। ধণাঢ্য পরিবার ছাড়া দরিদ্র পরিবারের সন্তানরাও ডে কেয়ারে বড় হবার সুযোগ পাবে– এটা ভাবাই যেতো না। সাজেদা ফাউন্ডেশন সেটাই করে দেখিয়েছে।

আমরা সাজেদা ফাউন্ডেশনের 'আমরাও মানুষ' মানিকনগর সেন্টারে যাই। তখন দুপুর ১টা। করোনার কারণে অধিকাংশ শিশুই তাদের পরিবারের সাথে রয়েছে। তবে তাদের মায়েরা দুপুর বিকেলের খাবার এখান থেকেই সংগ্রহ করছেন। তাদের কয়েকজনের সাথে কথা হলো: তাদেরই একজন রীতা, স্বামী জসিমউদ্দিন। থাকতেন খেলার মাঠের পাশে ঝুপড়িতে। এখন থাকেন কুমিল্লা পট্টিতে ১ রুম ১৫০০/- টাকা ভাড়ায়। স্বামী দিনমজুর। রীতা জানালেন তাদের ২ ছেলে মেয়ে। একটির বয়স ৯ বছর, অন্যটির ৩ বছর। এই বাচ্চা জন্ম নেয়ার পর তার বাসায় কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়। সংসার চালাতে ভীষণ কষ্ট হয়। সে সময় জানতে পারেন সাজেদা ফাউন্ডেশনের ডে কেয়ার সেন্টারের কথা। তিনি তার মেয়েকে এখানে দিয়ে নিশ্চিন্তে কাজে যেতে পারেন।

সেতুর স্বামী রিকশাচালক। স্বামী কাজে গেলে তার পক্ষে বাসায় কাজ করা সম্ভব হতো না। সেতু তার তিন বছরের শিশুকে 'আমরাও মানুষ' ডে কেয়ার সেন্টারে দিয়ে নিশ্চিন্তে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। রীতা ও সেতু জানালেন, তাদের সন্তানরা এখানে স্বাস্থ্যসম্মত সেবা, পরিবেশ সম্মত থাকা ও পুষ্টিকর খাদ্য পাচ্ছে। চিকিৎসার সুযোগও পাচ্ছে। সকালে এসব শিশুদের কলা, ডিম, বিস্কুট, বাদাম দেয়া হয়। দুপুরের খাবারে মাছ, মাংস, গরুর কলিজা, পায়েস, সেমাই, সবজি খিচুড়ি দেয়া হয়। তারা জানালেন, সন্তানদের এতো উন্নতমানের পরিবেশ এবং ভালো খাবার দেবার সামর্থ্য তাদের ছিল না। এখানে শিশুরা আচার-আচরণ শিক্ষা থেকে শুরু করে ভালোভাবে পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছে। এরকম ১০/১২ জন অভিভাবক সাজেদ ফাউন্ডেশনের এই 'আমরাও মানুষ' কর্মসূচির প্রশংসা করলেন, কৃতজ্ঞতা জানালেন। জানা গেছে 'আমরাও মানুষ' এর কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তবে, সাজেদা ফাউন্ডেশনের এ ধরনের কার্যক্রম দেখে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে আসতে পারে।■

সাজেদা ফাউন্ডেশন ছিন্নমূল মানুষদের জন্য বাথরুম ও টয়লেটের সুযোগ করে দিয়েছে।

নগরায়ণ যতই হচ্ছে শহুরে দরিদ্রের সংখ্যা ততই বাড়ছে

জাহিদা ফিজ্জা কবির
প্রধান নির্বাহী, সাজেদা ফাউন্ডেশন

দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতে এমন অনেকেই আছেন যাদের ঈর্ষণীয় সাফল্য দেশকে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদেরই একজন এনজিও সেক্টরের অন্যতম প্রতিষ্ঠান সাজেদা ফাউন্ডেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) জাহিদা ফিজ্জা কবির। কৃতি ও মেধাবী ব্যক্তিত্ব জাহিদা ফিজ্জা কবির তার উদ্ভাবনী যোগ্যতা, মেধা ও দেশ-বিদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সাজেদা ফাউন্ডেশনকে দেশের উন্নয়ন খাতের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছেন। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পিত উদ্যোগ এবং সর্বোপরি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতার ফলেই তার নেতৃত্বে ক্রমাগত সাফল্যের সিঁড়ি পেরোতে সক্ষম হচ্ছে সাজেদা ফাউন্ডেশন। তিনি একই সাথে দেশের উল্লেখযোগ্য ঔষধ প্রতিষ্ঠান রেনাটা লিমিটেড এর পরিচালক। এছাড়াও তিনি হেলথ এন্ড কমিউনিটি কেয়ার লিমিটেড, ইনার সার্কেল প্রাইভেট লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাইকোলজিক্যাল হেলথ এন্ড ওয়েলনেস ক্লিনিক লিমিটেড এর চেয়ারপার্সন এবং একশ্যান এইড এর চেয়ারপার্সন। এর আগে তিনি সাজেদা ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক ও সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মেধাবী ও দক্ষ নির্বাহী জাহিদা ফিজ্জা কবির ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারকালচারাল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আমেরিকার ভারমন্ট স্কুল ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং থেকে স্নাতক এবং ইউনিভার্সিটি অব দ্য ফিলিপাইনস থেকে সোশ্যাল ওয়ার্ক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে অর্গানাইজেশনাল লিডারশিপ বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

দেশের দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ এই উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে যা বলেন, তা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

প্রত্যয় : সাজেদা ফাউন্ডেশন দেশের এনজিও খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। দারিদ্র্য নিরসনসহ আপনারা সামাজিক উন্নয়নের অনেক খাতেই কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা এ বছর স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি। এই মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসন কতোটা সম্ভব হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন এর কাজগুলো আমরা যুদ্ধ পরবর্তীকাল থেকে সরকারি ও বেসরকারি এনজিও প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে শুরু করেছিলাম। এনজিও সেক্টর এখানে অনেক বিরাট একটা ভূমিকা রেখেছে; যার ফলে আমরা অনেকদূর আসতে পেরেছি এবং আমি মনে করি এশিয়াতে আমরা একটা উদাহরণ তৈরি করেছি– বিশেষভাবে দক্ষিণ এশিয়াতে যদি দেখি, দারিদ্র্যের সবকটি সূচকে আমরা এগিয়ে আছি। এখানে অনেক কাজ হয়েছে, অনেক সাফল্যের গল্প আমাদের আছে, অনেক মাইলফলক আমরা পার করেছি। যেমন আমরা টিকাদান কার্যক্রমের কথা বলতে পারি, খাবার স্যালাইনের কথা বলতে পারি, পানিশূন্যতার কথা বলতে পারি। বিশেষ করে এই কার্যক্রমগুলো স্বাস্থ্য খাতে বিরাট একটা ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া শিক্ষা খাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ক্ষুদ্রঋণ এর কথা যদি বলি, অবশ্যই ক্ষুদ্রঋণ নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট একটা ভূমিকা পালন করেছে। নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণ যদিও একটা আর্থিক বিষয় তবুও এটা পরিচালনা করতে গিয়ে যে প্রক্রিয়াগুলো আমরা অনুসরণ করি, সেখানে নারীকে কর্মক্ষেত্রে নিয়ে আসার ব্যাপারে এটা অবশ্যই বিরাট একটা ভূমিকা পালন করেছে। তাই আমি বলবো এই সেক্টরে আমাদের অনেক বড় সাফল্য আছে এবং এখন আরো কিছু পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে। বিশেষ করে করোনার কারণে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই কিছুটা পিছিয়ে পড়েছি, দরিদ্র্যের হার আবার বেড়ে গেছে, অনেকে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে এসেছেন। আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে এসেছে, সেটি হচ্ছে নগরায়ণ যতই হচ্ছে, শহুরে দরিদ্রের সংখ্যা ততই বাড়ছে এবং বিভিন্ন কারণে সরকারের যে সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো আছে সেগুলোর আওতায় এই জনগোষ্ঠী আসতে পারছে না। সরকারের সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে আসা আমার কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ মনে হয় এবং আমি মনে করি নগরের অতি দরিদ্রদেরকে লক্ষ্য করে বিশেষ কার্যক্রম করা দরকার। আরেকটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, যখন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় তখন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক একটা ভেদাভেদ প্রকট হয়। এটা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়।

প্রত্যয় : আপনি যে নগরায়ণের কথা বললেন, যার ফলে বস্তি বেড়ে যাচ্ছে আবার উচ্ছেদও হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকার কি কোনো কার্যক্রম নিতে পারে বলে মনে করেন?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : এটি আসলে শুধু বস্তিই বলবো না; অনেক মানুষ তো রাস্তায়ও থাকে। এ নিয়ে সাজেদা ফাউন্ডেশন বহু বছর ধরে কাজ করে আসছে। হ্যাঁ সরকার অবশ্যই কার্যক্রম নিতে পারে কিন্তু এটা পৃথিবীব্যাপীই যদি আপনি দেখেন, যতই নগরায়ণ হয় ততই কিন্তু এই সমস্যাটা থাকে। কাজেই বাংলাদেশের মতো দেশে এটা প্রকট হওয়াটা স্বাভাবিক। রাজধানীকেন্দ্রিক উন্নয়নটা সেভাবে এগোয়নি। এই সমস্যাটা যে এক দিনেই সরকার একটা বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাধান করে ফেলতে পারবে এটা আমি মনে করি না। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বিষয়। শুধু বাড়ি করে দিয়ে যদি তাদেরকে আমরা গ্রামে পাঠিয়ে দেই তাহলে সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। কারণ, সেখানেও তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমাদের মতো মানুষেরা যে কারণে ঢাকায় থাকি– স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সব ঢাকাকেন্দ্রিক। সেই কারণেই গরিব মানুষরা ঢাকার দিকে ধাবিত। ঐ বাস্তবতাটা কমবেশি সকলের জন্য একই। যদি আমরা বিকেন্দ্রীকরণ না করতে পারি এবং গ্রামে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারি তাহলে এই সমস্যাটা আরো প্রকট হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রত্যয় : সরকার বিভিন্ন সময় উদ্যোগ নিয়েছে যে যারা এখানে ভাসমান আছে, তারা যদি গ্রামে ফিরে যায় তাহলে তাদেরকে কিছু আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে। এটা যদি এনজিও সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সরকার এই কার্যক্রম নিত তা হলে সেক্ষেত্রে সুফলটা বেশি আসতো কি?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : হ্যাঁ- অবশ্যই। শুধু সরকার না আমাদের এনজিও সেক্টরেরও এখন বাংলাদেশে যে আর্থ-সামাজিক অবস্থা অর্থাৎ আমরা যুদ্ধ পরবর্তীকালে যেমন পাশাপাশি অনেক কাজ করেছি, এনজিওরা যে যার মতো কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, সরকারের সাথে প্রয়োজনে সংযুক্ত না হয়েও আমরা কাজ করেছি। কিন্তু এখনকার যে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সেখানে যে কর্মকাণ্ডই আমরা করি সেটা সরকারের সাথে মিলেই আমাদের করতে হবে, সেটাই বাস্তবতা। তা যত কঠিনই হোক না কেন এবং সেখানেই আমাদের সুফল আসবে। আর শহুরে দরিদ্রদের জন্য যে সার্বিক উন্নয়ন দরকার তার জন্য সরকার-এনজিও অংশীদারিত্ব যদি করা যায় তা হলে অনেক বেশি সাফল্য আসবে।

প্রত্যয় : সরকার-এনজিও অংশীদারিত্বের কথা এলো যেমন স্বাস্থ্য খাতের কথা বলেছেন, শিক্ষা উন্নয়ন হয়েছে, নারী নেতৃত্বের অনেক উন্নতি হয়েছে, আরবান পুওর নিয়েও গত ৫০ বছরে কাজ করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এগুলো কি জানে? নাকি তারা মনে করে যে শুধু সরকারই এ কাজগুলো করছে– আপনার কি মনে হয়?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : না, আমার কাছে মনে হয় না। আর না জানার জন্য দায়ী আমরাই। কারণ, আমরাই জানাতে পারিনি। আমরা আমাদের নিজেদেরকে তুলে ধরতে পারিনি। আমরা আমাদের নিজেদের উন্নয়ন বা একটা সেক্টরের উন্নয়ন বা মানব সম্পদ উন্নয়ন– এগুলোতে কর্পোরেট সেক্টর যতই এগিয়ে গেছে সেখানে আমরা ততোটা এগোতে পারিনি। এই খাতে আমাদের যতোটা অবদান আছে সেই অনুযায়ী হয়তো সাধারণ মানুষের জানা নেই। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে আমি একটু ভেদাভেদ করব : বিশেষ করে আমি বলবো যুব সম্প্রদায়ের কথা। যুব সম্প্রদায়ের এই বিষয়টি আমার কাছে চ্যালেঞ্জ মনে হয়। ডেভেলপমেন্ট সেক্টর বলতে আমরা কি বুঝি? এই ধারণাটাই যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই। এই জিনিসটা পারিবারিক পর্যায়েও আলোচনা হয় না আজকাল। স্কুল লেভেলেও শিক্ষা কার্যক্রমে ডেভেলপমেন্ট সেক্টর বা উন্নয়ন খাত বলতে আমরা কি বুঝি এ ধরনের কোনো শিক্ষা আছে বলে আমার জানা নেই। তরুণদের সাথে যখন কথা বলি তখন তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে খুব বড় একটা শূন্যতা দেখতে পাই। এর যে প্রভাব সেটা ভবিষ্যতে আমাদের জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং হবে।

প্রত্যয় : ডেভেলপমেন্ট সেক্টর এক সময় পরিচিত ছিল এনজিও সেক্টর হিসেবে। এ সেক্টরটা বয়স্কদের জন্য, ইয়াংদের জন্য না। এমন একটা কনসেপশন ছিল এক সময়। আপনি কি মনে করেন?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : এই ধারণাটা আমরাই তৈরি করেছি, কারণ আমরা জায়গা ছাড়তে রাজি নই। যেমন আমরা একটা অবস্থানে বসেছি, ওই প্রতিষ্ঠানে থেকেই ওই পদবীতে থেকেই আমার কাজের ধরন পরিবর্তিত হতে পারে, কাজ পরিবর্তন হতে পারে বা আমার আরো শেখার দরকার আছে। আমি মনে করি যে নিজেদের নিয়ে এই সেক্টরের একটা ধারণা আছে যে, আমি চূড়ায় পৌঁছে গেলে সেখানেই শেষ, এরপর আর শেখার কোনো দরকার নেই। প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে হলে শেখাটাই হচ্ছে চলমান প্রক্রিয়া। আপনি একটা বড় পদে কর্মরত থাকতে পারেন তার মানে এই নয় যে আর শেখার দরকার নেই। সুতরাং ঐ জায়গাটাতে একটা সমস্যা হয়েছে বলেই আমি মনে করি। এ কারণেই তরুণ প্রজন্ম মনে করে যে, এই জায়গাটা তাদের জন্য না।

তাদেরকে এ ব্যাপারে মনোযোগী করার জন্য আমাদেরকে উদ্যোগ নিতে হবে। সাজেদা ফাউন্ডেশন সচেতনভাবে সেই উদ্যোগগুলো নিয়েছে। আমাদের অফিসের কর্মীদের গড় বয়স ৩৫ বছর।

প্রত্যয় : আপনাদের মূল স্লোগান হচ্ছে সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও মর্যাদা। এই লক্ষ্যে আপনারা কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : একটা হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ। এই কার্যক্রমের বিভিন্ন ধরনের বিভাজন আছে, বিভিন্ন স্তরে আমরা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ করি। এ ছাড়া আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম আছে যেমন স্বাস্থ্য, হত দরিদ্রদের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম, শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য। সেখানে আমরা বেশ কিছু কাজ করি। এছাড়া আমাদের সামাজিক উদ্যোগ আছে কিছু। এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে আমরা আপাতত সমাজের উঁচু স্তরে যারা আছেন তাদেরকে সেবা দিয়ে থাকি। আস্তে আস্তে আমরা মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য ক্লাসকে সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছি।

প্রত্যয় : জনগণ মনে করে যে দেশে যতো উন্নয়ন হচ্ছে তা দেশের সরকারই হয়তো করছে। সরকার হয়তো মেন্টর রোল নিচ্ছে– ঠিক আছে, কিন্তু এনজিওরা যে করছে এটা জানানো যায় কীভাবে? খুব মার্জিতভাবে জনসাধারণকে এটা কীভাবে বোঝানো যায় বলে আপনি মনে করেন?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : এটা বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে। যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে ওয়ার্কশপ- সেমিনার করা, সাধারণ কিছু আলোচনা করা, কেস স্টাডি তৈরি এবং শেয়ার করা। উন্নয়ন খাতে যারা বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব আছেন তাদেরকে নিয়ে টক শো করা, এ সংক্রান্ত বই/প্রকাশনা প্রকাশ করা। আমাদের এই খাতে আরেকটি সমস্যা হলো নথিপত্র এবং প্রমাণ সেভাবে তৈরি হয়নি মানে গবেষণার দুর্বলতা আছে। কয়েকটি সংস্থা ছাড়া গবেষণায় খুব একটা বিনিয়োগ হয়নি। সুতরাং যতই কাজ করি সেটি যদি ভালোভাবে নথিপত্র না করা হয় আর প্রমাণিত না হয় তা হলে সঠিকভাবে বিষয়গুলো তুলে ধরা যায় না। তো এই জায়গাতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ইম্প্যাক্ট স্টাডিজ এগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট দরকার বলে আমি মনে করি। কিছু কিছু জায়গা ধরে রাখতে হলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত হতে হলে প্রমাণ হাতে থাকতে হবে। আমি করেছি শুধু এটা বললে তা প্রমাণিত হবে না।

প্রত্যয় : এ রকম গবেষণার অনেক প্রয়োজন আছে এবং হয়তো এটা অপ্রতুল। এ ক্ষেত্রে মিডিয়ার কথা যদি বলি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে অনেকেই মিডিয়া করে কিন্তু এনজিও সেক্টরে সেভাবে প্রচার নেই। বুরো বাংলাদেশ থেকে আমরা একটা ম্যাগাজিন বের করছি এবং এটা সবখানে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। এ ব্যাপারে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি না?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : আমি এটাকে সমর্থন করি। বুরো থেকে একটা সাধারণ ম্যাগাজিন বের হচ্ছে যেখানে খুব সাধারণভাবেই গল্পগুলো বলা হচ্ছে। খুব তড়িঘড়ি করে সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় মিডিয়ায় প্রচার করলে এটা আমাদের জন্য খুব সুখকর হবে না। আর হলেও আমি মনে করি এটা মোর অফ ইম্প্যাক্টবেজড, মোর অফ কেসস্টাডিবেজড হওয়া উচিত যে আমরা এতটুকু করেছি আপনাদের সাহায্য চাই। পথটা বরং খুব সাধারণ হওয়া উচিত। আমরা এটা করেছি, ওটা করেছি বলার চেয়ে কি ভাবে উপস্থাপন করব সেখানেও একটু খেয়াল রাখা দরকার বলে আমি মনে করি। ।

প্রত্যয় : রেনাটা লিমিটেড দেশের একটি উল্লেখযোগ্য ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটির ৫১ ভাগ শেয়ারের মালিকানা আপনাদের। এ প্রতিষ্ঠানের আয়ের অর্থ কি কি খাতে ব্যয় করে থাকেন– বলবেন কি?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : আমাদের যেসব উন্নয়ন কার্যক্রম আছে যেমন হেলথ, হসপিটালসহ অন্যান্য সেখানে সবই আমরা ডিভিডেন্ডবেজড ইনকাম থেকে খরচ করে থাকি। আমরা খুব দাতা নির্ভর সংস্থা নই, আমাদের কিছু ডোনার ফান্ডিং আছে। ডোনার ফান্ডিং ছাড়াও আমরা নিজস্ব অর্থায়নে কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি, সেগুলো আমাদের ডিভিডেন্ড ইনকাম থেকে যায়। আরেকটা হচ্ছে যে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য যে খরচগুলো করা হয় যেমন তরুণ প্রজন্মের ওপর ইনভেস্ট করছি। আরেকটি হচ্ছে, আমরা অনেক কিছুর উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করছি বিশেষকরে উন্নয়ন কার্যক্রম, সেই উদ্যোগগুলো আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে হয় এবং সেগুলো যদি সফল হয় তখন আমরা দাতাদের কাছে অর্থায়নের এর জন্য উপস্থাপন করি বা করবো।

প্রত্যয় : আপনি দীর্ঘ সময় বিদেশে উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্গানাইজেশনাল লিডারশিপ ও সোশ্যাল ওয়ার্ক বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। অনেকেই মনে করেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। আপনার মন্তব্য কি?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : আমি মনে করি যে আমাদের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটা একটা প্রতারণা পর্যায়ের হয়ে গেছে। সেখানে একটা ব্যাপক পরিবর্তন দরকার। বিশেষ করে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সমানুভূতি এগুলো কীভাবে মানুষের মধ্যে নিয়ে আসা যায়, কিভাবে ছোটবেলা থেকে বাচ্চাদের শেখানো যায় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আমরা কোন পরীক্ষায় কত নাম্বার পেলাম, কয়টা স্টার পেলাম, কোন ডিগ্রি পেলাম– এদিকে আমাদের লক্ষ্য যতটা আছে শিক্ষা বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যটা নেই। সেই লক্ষ্যেকে কারিকুলামে নিয়ে আসা দরকার বলে আমি মনে করি।

প্রত্যয় : আপনি কি মনে করছেন যে আমাদের যে শিক্ষাব্যবস্থাটা আছে সেখানে ভ্যালু সেন্সটা খুব স্ট্রং না?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : জ্ঞানের দিক থেকেও যদি বলি যে সাহিত্য বলেন, ইতিহাস বলেন যেটাই বলেন– যেমন আমাদের সময় যেটা ছিল যে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান আমরা যখন পড়তাম ছোটবেলা থেকেই তখন আমরা স্বাস্থ্য-পরিচ্ছন্নতা-পুষ্টিকর

খাবার এগুলো সম্বন্ধে আমরা একটা সাধারণ জ্ঞান যেমন বাসায় পেয়েছি তেমনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও পেয়েছি। সাহিত্যের কথাই যদি বলি, ভালো ভালো বই পড়া– ইংরেজি বলেন, বাংলা বলেন সেটা কিন্তু পাঠ্য বইয়ের আকারে ভালো ভালো স্কুলে পড়ানো হতো। এখন কিন্তু এগুলো একদমই নেই। ঐ জায়গাগুলোতে জোর একেবারেই কমে গেছে আর মূল্যবোধের চর্চা করতে না পারি এবং যদি বাসায় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে করতে না পারি কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ ঐ জায়গাতে যদি ছোটবেলা থেকে লক্ষ্য স্থির করতে না পারি তা হলে তো আমার কাছে মনে হয় ঐ শিক্ষাটা বাসায়ও মূল্যহীন। আর একটা বিষয় হচ্ছে শিক্ষা শুধু বাচ্চাদের জন্য না আমার কাছে মনে হচ্ছে যে, প্যারেন্ট ইনভলবড এডুকেশন প্রয়োজন। অভিভাবকত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ। অভিভাবকদের ইনভলব করে শিক্ষা, কারণ আমাদের অভিভাবকদের ঐ জায়গাটায় শিক্ষার অনেক দরকার আছে বলে আমি মনে করি। মূল্যবোধের জায়গা থেকেও আমি বলব যে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এই পরিবেশটায় কিন্তু এখন অনেক শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে।

প্রত্যয় : আপনি বলতে চাচ্ছেন আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় জাতীয় উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে–

জাহিদা ফিজ্জা কবির : হ্যাঁ, এবং এটা ভবিষ্যতে আরো প্রকট হবে। আমরা নতুন প্রজন্মের দিকে এবং খুব নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে যখন তাকাই তখন এই মূল্যবোধের জায়গা কিংবা সাধারণ জ্ঞান থেকে যদি প্রশ্ন করা হয় তারা তখন অদ্ভুত ধরনের উত্তর দেয়। আমাদের শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, স্কুল-কলেজ এসব নিয়ে চিন্তা করলে হবে না, পারিবারিক স্তরে কিভাবে অভিভাবকদের সচেতন করা যায় সেটিও একটি বিষয়। যেটি আসলে ভবিষ্যতে আমাদের একটা সংকট তৈরি হবে। কোভিডের সময় আমরা অনেক বড় বড় মানুষদেরকে হারালাম। এই কোভিডে একটা প্রজন্ম শেষ হয়ে গেল। এখানে যে একটা শূন্যতা সেটা কিন্তু পূর্ণ হচ্ছে না। পরবর্তী প্রজন্মে যে ওই ধরনের মানুষরা বেরিয়ে আসছে তা কিন্তু না।

প্রত্যয় : শিক্ষা ক্ষেত্রে একটু পরিবর্তনের হাওয়া আনার জন্য এনজিও সেক্টর কাজ করছে। অনেক অনেক প্রতিষ্ঠান শিক্ষা নিয়ে কাজ করে। সাজেদা ফাউন্ডেশন শিক্ষা নিয়ে কোনো কাজ করছে কিনা বা এ খাতে আপনাদের কোনো প্রজেক্ট আছে কি না জানতে চাচ্ছি।

জাহিদা ফিজ্জা কবির : হ্যাঁ, শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের বৃত্তি কার্যক্রম, অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা এগুলোর ব্যবস্থা আমরা করেছি। এখন আমরা শিক্ষাকে একটু নতুন করে দাঁড় করাতে চাই। আমরা প্রয়োজনে নিজেরাই অনলাইন এর মাধ্যমে পাঠদান এবং শিক্ষাগত জ্ঞান দেয়ার ব্যবস্থা করব। আমরা কিছু ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছি যারা তরুণ এবং তাদের মাধ্যমে কোনো কার্যক্রম দাঁড় করানো যায় কি না এটিরই পরীক্ষা করছি আমরা। সাজেদা ফাউন্ডেশনের একটা লক্ষ্য আছে যে, সব কিছুই আমরা নিজেরা করব না, অন্যদের উৎসাহিত করাটাও সাজেদার একটা লক্ষ্য। অলরেডি আমরা চ্যালেঞ্জ ফান্ডের মাধ্যমে ছোট ছোট উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চিহ্নিত করেছি যাদের আমরা অনুদান দেব। যেমন- শিক্ষা। আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু ভালো উদ্যোগ যা ছোট আকারে করা হয়েছে সেটাকে হয়তো আরও প্রসারিত করতে আমাদের মতো প্রতিষ্ঠানের সহায়তা পেলে তারা আরো ভালো করবে। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বা তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা যেটা দেখি যে তাদের দক্ষতা বাড়াতে হলে যে সহায়তাগুলো লাগে সেটি হিসাব সংক্রান্ত, মানবসম্পদ, তথ্যপ্রযুক্তি, নিরীক্ষা ইত্যাদি। এখানে তাদের বিনিয়োগ/উৎসগুলো খুব লিমিটেড থাকে। আমরা তাদেরকে সেই সহায়তা করতে চাই আর যেখানে অর্থনৈতিক সহায়তা দরকার সেখানে তা দেবো।

প্রত্যয় : উইমেন লিডারশিপ নিয়ে আপনারা কি কিছু করছেন? এ ব্যাপারে আপনাদের কোনো ইনিশিয়েটিভ আছে কি?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : নেতৃত্ব বলতে আমি নারী-পুরুষ বলবো না, নেতৃত্ব বলতে নেতৃত্বের সবগুলো বিষয় নিয়েই আমরা কাজ করছি। আমি মনে করি, নেতৃত্ব মানে একটা অবস্থান না বা একটা ব্যক্তির ওপর বিনিয়োগ করা না। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। তা হলেই একটা পরবর্তী প্রজন্মে নেতৃত্ব তৈরি হবে। সাজেদা ফাউন্ডেশন সেটিই করার চেষ্টা করছে।

প্রত্যয় : ইয়াং জেনারেশন বা ইয়াং প্রফেশনালদের জন্য আপনাদের যে প্রোগ্রাম বা আপনাদের প্রচেষ্টা বা যে ইনিশিয়েটিভ আপনারা নিচ্ছেন এতে অন্যরাও কীভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারে বলে মনে করেন?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : প্রথম থেকে যদি বলি, আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ হুমায়ুন কবির, তিনি এ ব্যাপারে খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি অনেক প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দিয়েছেন কিন্তু একটা সময় পরে সব অবস্থান থেকে তিনি সরে এসেছেন। তিনি তখন পর্যন্ত সব জায়গায় উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন। কিন্তু মূল কার্যসম্পাদনে ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জায়গা যদি ছেড়ে না দেয়া হয় তা হলে আরেকজন আসবে কীভাবে? ওই ধারণাটা আমরা সাজেদাতে ধারণ করেছি। এই যে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অবস্থান ছেড়ে দেওয়ার বিষয়, যেটা এক দিনে হয় না এই বিষয়টিতে আসতে অনেকদিন ধরে চিন্তা করতে হয়। সে কারণে আমরা আলাদা স্তরে প্রতিবছর ১০ থেকে ১২ জন ইয়াং প্রফেশনাল নিই। আবার ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি নেই তাদেরকে ১৫ মাস কিংবা ১২ মাসের একটা কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাই এবং তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়াও আমরা যখন নিয়োগ দেই তখন বয়সটা দেখি এবং যখন উচ্চপর্যায়ে লোক নেই তখনও তাদের মনমানসিকতা আমরা যাচাই করে দেখি যে সে আসলে ঐ মানসিকতার মানুষ কি না যে তরুণদের দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

প্রত্যয় : আগে মানুষ ভাবতো, এনজিও সেক্টর হলো বয়স্কদের জন্য। এই সেক্টর তরুণদের জব সেক্টর, ক্যারিয়ার সেক্টর– এখন এরকম ভাবার সুযোগ আছে কি?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : হ্যাঁ, থাকতে পারে তবে সেটা খুবই সীমিত। স্বল্প কিছু প্রতিষ্ঠান এটা চিন্তা করছে, কাজ করছে। এটা খুবই কম। আমি এখনো দেখি না যে ব্যাপকভাবে হচ্ছে। এটা কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্তরে দেখি। মাঠ পর্যায়ের কাজ একটা বয়সের পর করা যায় না সেই আঙ্গিকে তরুণদের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করি।

প্রত্যয় : আপনারা স্বাস্থ্য খাতে বেশ কিছু উন্নয়ন উদ্যোগ নিয়েছেন– এই কার্যক্রম দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন কি?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : হ্যাঁ করবো। আগে যেটি বললাম যে আমরা কিছু প্রারম্ভিক কার্যক্রম পরিচালনা করছি। সেই কার্যক্রমগুলো যদি সফল হয় তা হলে বেশ বড় আকারে হয়তো করব না, তবে করব। আমাদের প্রসার হবে কমিউনিটিবেজড কার্যক্রমে। সারা দেশে হাসপাতালে ছড়িয়ে দিতে গেলে যে হাসপাতালের জন্য দক্ষ জনবল দরকার তা খুব কম। আমরা অনেক বছর ধরে হাসপাতাল পরিচালনা করে আসছি– তবে এটা চালানো খুব কঠিন।

প্রত্যয় : একটি বিষয় ভালো লাগলো যে আপনারা যে সিদ্ধান্তগুলো নেন তা অস্পষ্ট নয়– আপনারা কি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল করবেন?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : অস্পষ্ট না হওয়ার কারণ যে আমরা ঐ পথ দিয়ে গেছি এবং কাজ করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে এখন শিখেছি। সে কারণেই আমাদের নির্দেশনায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। আমরা বার বার যেটি বলি যে, আমরা যেহেতু অনেক প্রারম্ভিক প্রকল্প করছি কিন্তু সব তো আর সফল হবে না। সেক্ষেত্রে যেটা সফল হবে না সেটা করব না, আসলে কোনটা করব আর কোনটা করব না এই জায়গাতে একটা স্পষ্টতা এসেছে। যে কারণে বলতে পারছি যে আমরা মেডিকেল কলেজে যাব না।

প্রত্যয় : আর্থিক ও সাংগঠনিকভাবে সক্ষম এমএফআইসমূহকে সরকারি নিয়ম মোতাবেক ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক হিসেবে অনুমোদন দেয়ার ব্যাপারে আপনার প্রস্তাবনা কি?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : আমি তো মনে করি এটা অবশ্যই হওয়া উচিত। অনেক আগেই একটা খসড়া প্রস্তাব আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ে দিয়ে রেখেছি। বেশ কিছু সংস্থা এটার জন্য প্রস্তুত বলে আমি মনে করি। এই প্রস্তাবনা কোনো কারণে হয়তো আটকে আছে। এটা অবশ্যই হওয়া উচিত। আবার দেখেন যে আমাদের যারা কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠী এখন ব্যাংকগুলোও তাদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে যদি আমাদেরকেও প্রতিযোগিতায় থাকতে হয়, তা হলে ঐ রকম একটা আইনের আওতার মধ্যে আমাদেরকেও আসতে হবে।

প্রত্যয় : আপনি কি এটা এককভাবে চিন্তা করছেন না কি–

জাহিদা ফিজ্জা কবির : না, না। এটা এককভাবে তো কিছুতেই সম্ভব না। একটা রেগুলেশন হওয়ার ব্যাপার, একটা আইন পাস হওয়ার ব্যাপার। সেক্টর হিসেবেই এটি শুরু হয়েছিল, এককভাবে না। সেক্টর হিসেবে নীতিমালাটা জমা দেয়া হয়েছিল কিন্তু তারপর এটা আর খুব একটা এগোয়নি।

প্রত্যয় : ধরুন সেক্টরাল একটা অ্যাপ্রোচ নেয়া আছে, কিন্তু যখন ব্যাংক করতে যাবেন তখন কি আপনারা এটা ভাবছেন যে তিনটা এনজিও মিলে একটা ব্যাংক হবে নাকি যাদের সামর্থ্য আছে তাদের তিনটা আলাদা আলাদা ব্যাংক হবে– কোনটাকে আপনি প্রাধান্য দেবেন?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : এত পোক্তভাবে তো বলা যাবে না, তবে আইনটা পাস হলে তখন আলাপ-আলোচনা করা যাবে যে, তিনটা সংস্থা একত্র হবে কি না বা কীভাবে হবে।

প্রত্যয় : সম্প্রতি সাজেদা ফাউন্ডেশন জিরো কুপন বন্ড পেয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত যদি সংক্ষেপে বলতেন–

জাহিদা ফিজ্জা কবির : এটা আমরা করেছি কারণ, ওই মুহূর্তে আমাদের টাকার দরকার ছিল। এটা হচ্ছে ডাইভারসিফিকেশন অব ফান্ডিং রিসোর্সেস। ডাইভারসিফাই করার জন্যই আমরা এ উদ্যোগটা নিয়েছিলাম। শুধু ব্যাংকের ওপর নির্ভর না হয়ে অন্য কোনো পথে অর্থ যোগান করা যায় কি না। এটার খুব ভালো সাড়া পেয়েছি। আর সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ থেকেও তাদের একটা উৎসাহ আছে, এমআরএ-ও সহায়তা করেছে। আগামীতে আরো হবে বলে আমি মনে করি। এতে একটা আস্থার জায়গা সৃষ্টি হয় এবং প্রতিষ্ঠানেরও সুনাম বাড়ে।

প্রত্যয় : এনজিও সেক্টরের প্লাটফর্ম হিসেবে এফএনবিকে কীভাবে দেখেন?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : আবেদ ভাই মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে আমাদের ডেকে বলেছিলেন যে, সিডিএফ, ইনাফি বা অন্য যা যা নেটওয়ার্ক আছে তোমরা সবাই এক হয়ে যাও। সবাই এক হয়ে একটা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি কর। কারণ আমার পরে কিন্তু তোমাদের এটা দরকার হবে। এখানেই আবেদ ভাই ভিন্ন একজন ব্যক্তিত্ব। তার চলে যাওয়াটা আমাদের জন্য বিরাট একটা ক্ষতি হয়ে গেল। কারণ, তিনি নিজের কথা চিন্তা করতেন না, সার্বিকভাবে সেক্টর নিয়ে চিন্তা করতেন। এখন আমি এটা খুবই অনুভব করি। তারপরও একটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কিন্তু সেভাবে কোনো জায়গায় এগোল না। তারপর আবার ক্ষুদ্রঋণ খাতেও আমরা ভাবছিলাম যে কিছু একটা এগোবে কিন্তু সেটাও খুব একটা এগোচ্ছে না। এই সেক্টরে আমাদের হয়ে যে কথা বলবে এমন কোনো নেতৃত্ব বা নেটওয়ার্ক সেভাবে নেই।

প্রত্যয় : এর কারণ কি বলে আপনার মনে হয়? আর কীভাবে এটার সমাধান করা যায়?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : আমি বলবো নেতৃত্বের অভাব। এডাব কিংবা ইনাফি বলেন এই নেটওয়ার্কগুলো তৈরিতেও আবেদ ভাইয়ের মতো মানুষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং তারা দাতাদের সাথে কথা বলেছেন বা অন্যান্য যারা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাদের মাধ্যমে অনুদানও এসেছে। এভাবেই তো দাঁড়িয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলো। এখন আমাদের যেই প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদেরকে উৎসাহিত করতে ইচ্ছা করে না। যদি ভালো নেতৃত্ব তৈরি করে একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যায় অবশ্যই এটাকে আমরা সবাই উৎসাহিত করবো। আমাদের একজন নেতৃত্বের দরকার কিন্তু সেই নেতৃত্ব নেই। আমাদের মনে হয় যেন আমরা এতিম হয়ে গেছি।

প্রত্যয় : আমরা বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পার করছি। এই পঞ্চাশ বছরে আমাদের অনেক অর্জন আছে। অনেক ব্যর্থতাও আছে। এনজিও সেক্টরও বেশ অবদান রেখেছে। আগামী বছরগুলোতে এই সেক্টরকে আপনি কি পর্যায়ে দেখতে চান?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : আমার কাছে মনে হয় যে, চেহারাগুলো পাল্টে যাবে। আর একটা ব্র্যাক তৈরি হবে না। সাজেদা ফাউন্ডেশন যদি বলে আগামী ২৫ বছরে ব্র্যাক হবে, সেটা সম্ভব হবে না। চেহারাটা অন্য রকম হবে। টিকে থাকার একটা ব্যাপার আছে। দাতা অনুদান কমে যাচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য আরো কমে যাবে হয়তো। আবার কাজের ধরনও পাল্টে যাবে। যে কাজগুলো এনজিও সেক্টর থেকে করা হতো সেগুলো সরকার পর্যায় থেকে করা হবে। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়, যে সংস্থাগুলো নতুন কিছু আনতে পারবে, নতুন ধরনের কাজ করতে পারবে সেই সংস্থাগুলোই এগিয়ে যেতে পারবে।

প্রত্যয় : এমআরএ এনজিও সেক্টরের জন্য অনেক কাজ করছে, তারা অনেক ইনিশিয়েটিভও নিয়েছে। এমআরএ'র কার্যক্রম নিয়ে আপনি সামগ্রিকভাবে কি মনে করেন? তারা কি সঠিক পথেই আছে?

জাহিদা ফিজ্জা কবির : হ্যাঁ, অনেক পরিবর্তন দেখছি আমি। এমআরএ আমাদেরকে বোঝার চেষ্টা করছে। আমাদের কথা শোনার চেষ্টা করছে। এটাকে আমরা ইতিবাচকভাবেই দেখছি। এমআরএ যদিও মাইক্রোফাইন্যান্সের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কিন্তু তারপরও তারা আমাদের সামগ্রিক কার্যকলাপগুলো দেখে– সেগুলো যাতে মানুষ জানতে পারে সেটার উদ্যোগও তারা নিয়ে থাকে। আমি মনে করি এমআরএ তার অবস্থান থেকেও আমাদের একটা সাপোর্ট দিচ্ছে।■

কোডেক : উপকূলীয় জেলেদের ভাগ্যোন্নয়নের চাবি

দেশের বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে চট্টগ্রামের কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CODEC) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। শুরুতে ১৯৮১-৮৫ সাল পর্যন্ত ডানিডার সহায়তায় চট্টগ্রামে Boat Rental Scheme প্রকল্প চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৫ সালের ১ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার ও রয়েল ডেনিস অ্যাম্বাসির অনুমোদনের মাধ্যমে Codec প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সমুদ্র উপকূলবর্তী ৭টি গ্রামের জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এটি কাজ শুরু করে। বর্তমানে ১৩টি উপকূলীয় জেলার ৭৭টি উপজেলার ৮০০ ইউনিয়নে ২ মিলিয়নেরও বেশি অনগ্রসর মানুষকে সেবা দিচ্ছে কোডেক। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি বাজারের একটি ছোট্ট অফিসে মাত্র ১৮ জন সদস্য নিয়ে শুরু হওয়া এই সংগঠনটিতে বর্তমানে ৫ হাজারের মতো নিবেদিতপ্রাণ কর্মী রয়েছে, যারা আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছে।

প্রথমে জেলেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষার উদ্যোগ নিলেও কোডেক এখন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহায়তায় শিক্ষা, সুরক্ষা, পুষ্টি, জীবিকা, পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন-উন্নয়নের এই ক্ষেত্রগুলোতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া ১০৩টি শাখার মাধ্যমে কোডেক উপকূলীয় দরিদ্র ও অস্বচ্ছল জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যে ১২ জেলায় ক্ষুদ্রঋণ পরিচালিত হচ্ছে সেগুলো হলো চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা এবং খুলনা। কোডেককে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দানকারী ডোনার হচ্ছে Danida Bangladesh, Asian Foundation, STROMME Foundation, CARE, Oxfam, PRIP trust, CEEE-GIZ প্রমুখ। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সলিমপুরে 'জলদাস জেলেগ্রাম' আশির দশকের গোড়ার দিকে সেই গ্রামটিতে কোনো শিশু বিদ্যালয়ের মুখ দেখেনি। কোডেকের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তায় অনেক লোক এখন শিক্ষিত এবং তাদের জীবন-জীবিকাও বেশ উন্নত হয়েছে। কোডেক ২০১১ সাল থেকে নিজস্ব অর্থায়নে সলিমপুরে একটি স্কুল পরিচালনা করছে, যা থেকে ১৮০০ এর বেশি শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছে।

কোডেক রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোতে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করছে এবং ইউনিসেফ, ইউএনএইচসিআর, ডব্লিওএফপি এবং ইউএসএআইডি এর সহায়তায় শিক্ষা, সুরক্ষা, পুষ্টি ও পরিবেশ সুরক্ষা খাতে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কোডেক শিবিরে ৭০০টিরও বেশি লার্নিং এবং প্রটেকশন ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন করেছে যা ১ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা শিশুদের সহায়তা দেয়। ডব্লিউএফপি সমর্থিত কোডেকের স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম প্রকল্পের দ্বারা রোহিঙ্গা শিবির এবং আশপাশের হোস্ট সম্প্রদায়ের ৩৫ হাজার এর বেশি বাচ্চাদের পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য হাই এনার্জি বিস্কুট (এইচবি) সরবরাহ করছে।

প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা নিজ অবস্থান ঠিক রেখে স্বচ্ছতা, পরিশ্রম, দায়বদ্ধতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে থাকেন। তাদের সহযোগিতায় সহায়-সম্বলহীন মানুষ কোডেক থেকে স্বল্প পরিমাণ টাকা ঋণ নিয়ে অনেকেই এখন স্বাবলম্বী। এ রকমই বেশ কিছু উদাহরণের কথা জানা গেল। কোডেকের ঋণের টাকায় একটি গরু কিনে একজন গৃহবধূ মিনু আরা এখন ২০টি গাভির সমন্বিত খামার গড়ে তুলেছেন। তার স্বামী ছিল দিনমজুর, তিনি ছিলেন সহায়-সম্বলহীন; কোডেকের ঋণে এখন সফল নারী উদ্যোক্তা। অন্য একজন নাম ইউনুচ, পিতার মৃত্যুর পর তাদের গুনার জাল তৈরির কারখানা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোডেকের ঋণে কারখানাটি নতুন করে শুরু হয়। বর্তমানে তার দুটি কারখানায় ২১ জন কর্মচারী। কোডেকের ক্ষুদ্রঋণে প্রায় দেড় লাখ পরিবার আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে ১০ হাজার হতদরিদ্র পরিবার পাচ্ছে সহায়ক ক্ষুদ্রঋণ। ৩০টি বাস্তুহারা পরিবার পেয়েছে নিজের জমি ও ঘর। নদীভাঙনে ঘরবাড়ি হারানো ৬০৫টি পরিবার পেয়েছে 'আশ্রয়'। খাদ্য নিরাপত্তা এবং কৃষিজ উৎপাদনে নেয়া বহুমুখী কার্যক্রমে উপকার পাচ্ছে ৭৫ হাজার পরিবার। বর্তমানে কোডেক এর সঞ্চয় পোর্টফলিও হচ্ছে ৮৭৮.০৫ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণ আউটস্ট্যান্ডিং হচ্ছে ২২০২.৭৮ মিলিয়ন টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৯৮%।

এ সকল বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করে বলা যায়, একসময় উপকূলীয় হতদরিদ্র নোঙরহীন জেলে সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য যে কোডেকের জন্ম হয়েছিল সে কোডেক এখন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ মানুষের কল্যাণে ক্ষুদ্রঋণসহ বহুমুখী কার্যক্রমে নিজেদের বিস্তৃত করেছে। ইতোমধ্যে কোডেক প্রাতিষ্ঠানিক সফলতার চূড়ায় পৌঁছেছে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের জরাজীর্ণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে। সামাজিক বলয়হীন নিপীড়িত মানুষগুলোকে সামাজিকভাবে সংগঠিত করতে পেরেছে, তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পেরেছে। তাদের মাঝে শিক্ষার আলো বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। কোডেক এখন শুধু জলদাসদের বন্ধু নয়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীরও উন্নয়ন বন্ধু।■

জেলেদের উন্নয়নে ‘জেলে ব্যাংক’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া যায়

ড. কাজী খুরশিদ আলম
নির্বাহী পরিচালক
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CODEC)

বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের পথে হাঁটছে, অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এ দেশ এখন স্বনির্ভরতা অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যে দারিদ্র্য ছিল এ দেশের জন্য মারাত্মক অভিশাপ তা ব্যাপকহারে হ্রাস পেয়েছে। দরিদ্র মানুষেরা এখন আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়ে উঠছে। এই পরিবর্তনের পেছনে সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতের প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের অবদান ব্যাপক। তাদেরই একজন কাজী মোহাম্মদ খুরশিদ আলম। তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের শীর্ষ পর্যায়ের এনজিও/এমএফআই CODEC এর নির্বাহী পরিচালক।

কাজী মোহাম্মদ খুরশিদ আলম এর জন্ম বাগেরহাটের মিঠাপুকুর পাড়ের এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে। তিনি ১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে এমএসসি, ১৯৮৪ সালে ইউএসএর ওকলাহোমার সেন্ট্রাল স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ এবং ১৯৯৬ সালে ডেনমার্কের Aalborg University থেকে ডেভেলপমেন্ট সোসিওলজিতে পিএইচডি করেছেন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর তিনি চট্টগ্রামের নেদারল্যান্ডস ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্টস (NEDECO) এর অফিস ম্যানেজার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি ডেনিস বোট বিল্ডিং প্রজেক্ট, চট্টগ্রামের কন্ট্রোলার এবং ১৯৮৪ সালে বোট রেন্টাল পাইলট স্কীম, চট্টগ্রামের প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

এখানে দায়িত্বপালনকালে তার নেতৃত্বে Community Development Centre (CODEC) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক। ড. খুরশিদ আলম পেশা সুবাদে জেলে সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজের সুযোগ পান এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে CODEC প্রতিষ্ঠা করেন।

আত্মপ্রত্যয়ী ও মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ ড. খুরশিদ আলম কুমিল্লা বার্ড থেকে গ্রাম উন্নয়ন বিষয়ক এবং আমেরিকার বোস্টন এর ইনস্টিটিউশন ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটরস ওয়ার্কশপ এবং ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট রিসার্চে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন।

ড. খুরশিদ আলম একজন লেখক এবং গবেষক ব্যক্তিত্ব। তিনি তার কর্ম অভিজ্ঞতার আলোকে বেশ কিছু গবেষণাধর্মী বই লিখেছেন। এর মধ্যে ‘গকুল জলদাসের কথা’ বইটি ২০০৮ সালে UNESCO থেকে প্রকাশিত হয়। তার লিখিত The Holy Quraan and Science এবং ‘উপকূলীয় জনপদ : আমার উন্নয়ন ভাবনা’ বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামে কোডেকের প্রধান কার্যালয়ে গৃহীত একান্ত সাক্ষাৎকারে ড. খুরশিদ আলম যা বলেন এখানে তা উপস্থাপন করা হলো।

প্রত্যয় : CODEC কীভাবে প্রতিষ্ঠা পেলো তা জানতে চাচ্ছি। আপনারা ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার ও ডেনিস অ্যাম্বাসির সহায়তায় উপকূলীয় এলাকায় মৎস্যজীবী জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছেন। আপনাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কতোটা সফল হচ্ছে বলবেন কি?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : আমি চাকরিজীবনের শুরুতে চট্টগ্রামে নেদারল্যান্ডস ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্টস অফিসে কাজের সুবাদে সমুদ্রপাড়ের জেলেদের সাথে মেশার সুযোগ পেয়েছি। তাদের সমস্যাগুলোকে কাছ থেকে দেখেছি। পরে নেদারল্যান্ডস এর এ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শেই আমি কোডেক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেই। আসলে জেলেদের সমস্যার অন্ত নেই।

আমি যদি এই দীর্ঘ ৩৬ বছর পরও পেছন ফিরে তাকাই তা হলে দেখবো যে, এখনো এমন কতগুলো আইন আছে যেগুলো জেলেদের খুব ছোট করে। বলতে গেলে অপমান করে। যেমন ধরুন জেলেরা যখন মাছ ধরতে যায় তখন আইন আছে কারেন্ট জাল ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু যারা জেলেদের ধরতে যান তারা কি কারেন্ট জাল চেনেন? আমার তো মনে হয় তারা না চিনে না জেনেই জেলেদের ধরে আনেন এবং অনেকদিন তাদের জেলে থাকতে হয়; তাদের নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। এটা একটা দিক, অন্যদিক হচ্ছে যারা কারেন্ট জাল ব্যবহার করছেন না, অন্য ছোটখাটো মাছ ধরে জীবন-যাপন করেন তাদের জালটি ধরে যখন পুড়িয়ে ফেলা হয় তখন তাদের জীবন-জীবিকা একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যায়। একটা জিনিস দেখি যে জাল যারা কেনেন তাদেরকে অপরাধী করা হয়, কিন্তু জাল যারা তৈরি করেন তাদের তো কিছু করা হয় না! এই জিনিসগুলো অনেক ক্ষেত্রেই খুব পরস্পরবিরোধী। অনেক সময়ই জেলেরা কান্নাকাটি করেন যে তার জালটা তো কারেন্ট জাল ছিল না, সঠিক জাল– যেগুলো দিয়ে পোয়া মাছ বা ছোটখাটো অন্যান্য মাছ ধরা হয় এখন সেগুলো না চিনেও পুড়িয়ে ফেলা হয়। একজন জেলে খুব কষ্ট করে একটা জাল তৈরি করেন কিন্তু কেউ যদি অন্যায়ভাবে সেটি নষ্ট করে তা হলে এটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে এখনো আইনের কিছু ফাকফোকর আছে যেখানে সত্যিকারের জেলেরা তাদের আইডি কার্ড পায়নি। যদি তার আইডি কার্ড না থাকে এবং সমুদ্রে গিয়ে যদি মারাও যায় তা হলে তার পরিবার স্বামী বা পিতা হিসেবে তাকে শনাক্ত করতে পারবে না। এই বিষয়টি খুব গভীরভাবে দেখা উচিত। অনেক সময় সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করেন যে, এখন মাছ ধরা যাবে না। বিষয়টি ভালো এতে আমরা দেখছি যে মাছের মজুদ বাড়ছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে, সেই সময়ের জন্য তাদের বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন তো দিতে হবে। ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকার যেটি দেন তা খুবই অপর্যাপ্ত।

দেখা যায় পুরো মাসের জন্য জেলেদেরকে ৩০ কেজি বা ৪০ কেজি চাল দেয়া হয় কিন্তু যে পরিবারে ৫/৬ জন সদস্য আছে তাদের জন্য এটা কতটুকু সহায়তা দেয় এটা নিয়েও চিন্তা করা দরকার। আমরা যে জলদাস সম্প্রদায়ের কথা বলছি যারা সমুদ্রে ছোট ছোট নৌকা নিয়ে মাছ ধরেন এরা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম উপকূলে প্রায় ২৭টি গ্রাম আছে এরা এই কম্পিটিশনে থাকতে পারবে না। এক হচ্ছে মাছ দিন দিন কমে যাচ্ছে আর দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের থাকার জায়গাটাও শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রি আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই জেলেদের পুনর্বাসনের জন্য কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা চোখে পড়ে না। অথচ এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়াটা আশু প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তা না হলে আমাদের এই ১৭ কোটি মানুষকে যারা মাছের যোগান দিচ্ছে, তারা যদি টিকে থাকতে না পারে তা হলে আমাদের জীবন-মানের ঘাটতি হবে বলে আমি মনে করি। তাই তাদের সুরক্ষার জন্য সরকারের এগিয়ে আসা উচিত বলে আমি মনে করি।

একটা জিনিস আমরা ভুলে যাই, এই যে মৎস্যজীবী মানুষ যারা জলদাস, জলবংশী হিসেবে পরিচিত তারা ৯/১০ জেনারেশন ধরেই মাছ ধরছেন এবং একই সাথে তারা বিজ্ঞানীও। বিজ্ঞানী বলতে বলছি যে, এরা সমুদ্রের পানি ধরে বলতে পারে এটা ১০নং সিগন্যাল কি না। এটা আমাদের আবহাওয়াবিদরাও বলতে পারে না। ১৯৯১ সালের ঝড়ের পরে দেখেছি– আমরা হয়তো ১০নং সিগন্যাল দিয়েছি তাদের কাছে গেলে তারা বলছে যে না, বাবু বাড়ি যান এটা ১০নং সিগন্যাল না। এটাতে কিছু হবে না। ওরা এখনো সমুদ্রের পানি ধরে বলতে পারে যে আবহাওয়া কি হবে। এই ধরনের লোকগুলো কিন্তু দেশের জন্য অ্যাসেট, সেটি আমরা কখনই মনে করিনি। পুঁথিগত বিদ্যা হয়তো ওদের নেই কিন্তু প্রকৃতির যে বিদ্যা ওদের আছে সেটাকে সম্মান করা উচিত। আমরা যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে কোডেক প্রতিষ্ঠা করেছি তা কতোটা সফল হয়েছে জানি না। তবে একটা কাজ হয়েছে যে জেলে সম্প্রদায়কে সচেতন করতে পেরেছি, তাদেরকে শিক্ষার আলো দিতে পেরেছি। তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছি।

প্রত্যয় : দেশের মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য উন্নয়নে সরকারের যে কার্যক্রম রয়েছে তা কতোটা মৎস্যজীবীদের সহায়ক বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর সলিমপুর কোডেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জেলে পরিবারের সন্তানরা

ড. কাজী খুরশিদ আলম : আমার কাছে মনে হয় যে, বিজ্ঞান আর যারা প্রকৃতিতে বসবাস করেন তাদের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট সবসময়ই আছে। আপনি যদি মনে করেন যে, এখানে বিজ্ঞানকে অ্যাডাপ্ট করে প্রোডাকশন বাড়াবো সেটা এক জিনিস। সরকারের যে পরিকল্পনা বা বাস্তবায়ন হচ্ছে এতে আমার কোনো দ্বিমত নেই, তারা ভালো কাজ করছেন। আমার কথা হচ্ছে যে মাছের সাথে যাদের জীবন এবং জীবিকা জড়িত তাদেরকে নিয়ে যদি আমরা সামগ্রিকভাবে না ভাবি তা হলে একটু অবিচার হয়ে যাবে বলে আমার মনে হয়। আমি মনে করি মৎস্য অধিদপ্তরের উচিত জেলেদের সাথে সরাসরি যুক্ত থেকে তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে কর্মসূচি নেয়া–এতে করে মৎস্য অধিদপ্তর যেমন কমসাফল্য পাবে তেমনই জেলে সম্প্রদায়ের উপকার হবে দেশের মৎস্য সম্পদেরও উন্নয়ন ঘটবে।

প্রত্যয় : দেশের পশ্চাৎপদ মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আপনারা কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : আমি বলতে চাই যে, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকা বলতে চরবিশ্বাস, রাঙাবালির মতো এলাকায়ও মুসলিম যারা আছেন এবং মাছ ধরে জীবনযাপন করেন আবার আমাদের আশপাশে দেখি চট্টগ্রাম-লক্ষ্মীপুরে ট্রেডিশনাল জেলে আছেন, নোয়াখালীতে আছেন- দুই ধরনের জনগোষ্ঠী– যারা একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করেন তারা খুবই ন্যূনতম জীবনযাপন করেন। আমার মনে হয় এদের জীবন যাত্রার মানটা একটু বাড়ানো উচিত। বলা হচ্ছে ইলিশ মাছ বাড়ছে এটা হয়তো ঠিক কিন্তু সমুদ্রে কিংবা নদীর যে মাছগুলো ধরে জীবনযাপন করতেন সে মাছগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। আর স্বাভাবিকভাবে এসব মাছ কমবেই। কারণ, আমরা জমিতে যে কীটনাশক এবং সার ব্যবহার করছি সেগুলো পুনরায় নদীতে যাচ্ছে, সমুদ্রের পানিতে মিশছে ফলে অনেক ধরনের ছোট ছোট মাছ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এই জেলেদের বিকল্প কি ব্যবস্থা করা যায় সামগ্রিক কোনো পরিকল্পনা আমি এখনো দেখতে পাই না।

আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে, এনজিওরা হয়তো কতগুলো ছোটখাটো উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু যতক্ষণ না সরকারের সাথে একত্রে কাজ না হয়, সরকার যদি সেই কাজ গ্রহণ না করে তা হলে সেই কাজ টিকে থাকবে না। সে যত বড় এনজিওই হোক না কেন।

প্রত্যয়কে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন ড. কাজী খুরশিদ আলম

প্রত্যয় : আপনারা জেলেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন? তাদের সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনারা কি উদ্যোগ নিয়েছেন?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : অর্থনৈতিক উন্নয়নটাই যে তাদের এগিয়ে দেবে এটা আমি বিশ্বাস করি না। ছোট্ট একটি উদাহরণ দেই– আমরা বোট বিল্ডিং প্রজেক্ট শুরু করেছিলাম জেলেদের উন্নয়নে। পরে যখন আমরা সত্যিকারের এনজিও হয়ে কাজটি শুরু করি 'কোডেক' হিসেবে, তখন জেলেদের কাছে যখন যাই তখন তারা আমাদের বলেছে যে যান্ত্রিক নৌকা আমাদের দরকার নেই। কেননা যান্ত্রিক নৌকা কি করে চালাতে হয় তা শিখতেও আমাদের সময় লাগবে। বরং আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না– তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। এটা আমাদের জন্য বিশাল একটি অর্জন বলতে পারেন। কারণ প্রথমেই আমরা হিন্দু জেলেগ্রামে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

আমরা ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ৪৩ হাজার বাচ্চাদের প্রাইমারি শিক্ষা শেষ করে তারপরও যদি তারা পড়তে চায় তার জন্যও স্কলারশিপের আওতায় ব্যবস্থা রেখেছি। আবার এদের মধ্যে প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেছে এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় কাজও করছে। সেটাও আমাদের কাছে একটা বড় অর্জন। একটা এনজিওর পক্ষে একজীবনে এর থেকে আর কি করা সম্ভব। আমরা নন ফরমাল ১১টা স্কুল করেছিলাম পরে ১০টিই সরকারি স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখন সেখান থেকে ছেলেমেয়েরা এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে পাস করছে। এই স্কুলগুলো কিন্তু জেলেরাই পরিচালনা করেছে।

প্রত্যয় : এ ধরনের একটি কার্যক্রম পরিচালনায় আপনারা DANIDAসহ অনেক দেশি-বিদেশি ফান্ড ব্যবহার করছেন। এসব অর্থ ব্যয়ে আপনারা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কীভাবে নিশ্চিত করে থাকেন?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : ডানিডা সবসময় বলতো যে, একটা অর্গানাইজেশন যদি সত্যিকার অর্থে অর্গানাইজেশন হিসেবে দাঁড়াতে চায় তা হলে তার মেরুদণ্ড হচ্ছে ফাইন্যান্স। আর শুরু থেকেই আমরা এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে কার্যকর করেছি। এ জন্য কোডেকের যেকোনো প্রজেক্টে আমরা কোনো সিএ ফার্মের ছেলেমেয়ে ছাড়া ফাইন্যান্সের দায়িত্ব দেই না। এখনো ৪৩ জন লোক আছেন যারা কোনো না কোনো ফার্মের থেকে পাস করা এবং আমরা বুঝতে পারি যে সে ফাইন্যান্সটা কন্ট্রোল করতে পারবে কি না। এটা আমরা প্রথম থেকেই করে আসছি। আর ডানিডা তো ট্রান্সপারেন্ট না হলে ফাইন্যান্স করে না।

প্রত্যয় : লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, ডোনার ফান্ডের সহায়তায় আপনাদের অধিকাংশ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে– এর বিকল্প হিসেবে নিজস্ব ফান্ড গড়ে তোলার কোনো উদ্যোগ রয়েছে কি?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : আমার একটা জিনিস মনে হয় যে, কমার্শিয়ালি কোনো ইন্ডাস্ট্রি করা এবং সেখান থেকে ইনকাম হবে এটা আমি কখনো ভাবিনি। তার একটা উত্তর দিতে পারি যে, আমি যার সাথে প্রথমে কাজ শুরু করি তখন Mr. Erling Bendsen নামে একজন পার্মানেন্ট কনসালট্যান্ট ছিলেন। উনি বলতেন, খুরশিদ তুমি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে তার ইনকাম দিয়ে

কোডেক এর নির্বাহী পরিচালক
ড. কাজী খুরশিদ আলম ও সহকর্মীবৃন্দ

যখন চালাবা তখন কিন্তু বিড়াল থেকে তার লেজটা বড় হয়ে যাবে। তখন তোমার উন্নয়নের যে ভাবনা সেটি থাকবে না। ইনকামের দিকে তোমার নজর চলে যাবে। আমাদের প্রায় ২৮টা প্রজেক্ট আছে সেখান থেকে আমরা ১০-১৫% ইনকাম পাই সেটা কিন্তু আমরা কেউ নেই না, যা অনেক এনজিও ভাগ করে নেয়। এটা কোডেকের কোর ফান্ডে জমা হয়।

আমরা একটা স্কুল পরিচালনা করি নিজস্ব ফান্ডে, তারপর কোভিডের সময় আমরা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে প্রায় ১ কোটি টাকার মতো ডোনেশন করেছি, ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের সহায়তা দিয়েছি। এখনো প্রায় ২০ জন উপকূলীয় শিক্ষার্থী আছে, তারা মেডিকেল, বুয়েট, উইমেন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আমাদের স্কলারশিপে। তাদেরকে প্রতি মাসে আমরা ১০ হাজার টাকা করে দেই।

প্রত্যয় : সামাজিক উন্নয়নমূলক এনজিও কার্যক্রমের পাশাপাশি আপনারা ক্ষুদ্র অর্থায়নও করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আপনারা কোন কোন খাতে ঋণ প্রদান করছেন। আপনি কি মনে করেন দেশের তৃণমূল মানুষের উন্নয়নে সক্ষম এমএফআইদের দ্বারা দেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : পিকেএসএফ এর যে নিয়ম আছে সেই নিয়মে আমরা ঋণসমূহ দিয়ে থাকি। বিশেষ করে উপকূলে বসবাসরত অনগ্রসর মানুষদের আমরা ঋণ প্রদান করি। আমরা টার্গেট মেম্বার শিফট করিনি যে এদের দিলে টাকাটা ফেরত পাবো। বরং যে আস্তে আস্তে শুরু করে বড় হয়েছে সে এখন ৫ থেকে ১০ লাখ টাকা ঋণ নিচ্ছে। একদম পরিপূর্ণ লাভের কথা চিন্তা করে আমরা অর্থায়ন করছি না। আমাদের একটা তৃপ্তি আছে যে যার দরকার তাকেই আমরা টাকাটা দিচ্ছি।

প্রত্যয় : এ ধরনের উপকারভোগীর সংখ্যা কত?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : আমাদের ঋণগ্রহীতা আছে ১ লাখ ৫০ হাজার।

প্রত্যয় : আপনারা জেলে সম্প্রদায় নিয়ে কাজ করছেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন বিশেষায়িত ব্যাংক হয়েছে যেমন রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ইত্যাদি। জেলেদের জন্য এ ধরনের ব্যাংকের প্রয়োজন আছে কি?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : সরকার এখন যে নিয়ম করেছে তাতে আমাদের পক্ষে এ ধরনের কোনো ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না। তবে এটা ঠিক যে, এসব বিশেষায়িত লোকদের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংকের দরকার। কারণ, ওদের ইন্টারেস্ট রেট, রি-পেমেন্ট রেট সম্পূর্ণ আলাদা; ছকে বেঁধে দিলে ওরা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থাতেই থাকবে। ওদের জন্য যদি ব্যাংক করতে হয় তা হলে ওদের মতো করেই করতে হবে। আমি মনে করি কৃষি ব্যাংকের আদলে 'জেলে ব্যাংক' হতেই পারে।

প্রত্যয় : দরিদ্র জনগোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র পেশাজীবীদের উন্নয়নে ব্যাংক করা যেতে পারে বলে মনে করেন কি?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : নিশ্চয় করা যেতে পারে কিন্তু প্রথমে চিন্তা করতে হবে যে এই উদ্যোক্তারা সমমনা কি না। সকলের মধ্যে বোঝাপড়াটা সঠিক না হলে পরে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এটা করা জরুরি বলে মনে করি। আর একটা বিষয়ে বলতে চাই যে, আমরা জেলেদের সাথে ৪০ বছর ধরে কাজ করছি এবং তাদের সম্পর্কে ভালোই বুঝি। শুধু আমি না আমাদের মতো অনেকেই আছেন যারা এই কাজটা করছেন– আমরা যদি একটা পার্টনারশিপে থাকি তা হলে ওদের জন্য কি করতে হবে সেটা কিন্তু আমরা করতে পারব।

প্রত্যয় : দেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এবং সম্প্রতি বাংলাদেশ এসডিজি অগ্রগতি বিষয়ক সম্মাননা লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে এনজিও খাতের অবদান কতোটা বলে আপনি মনে করেন?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : আমি এটাকে দুভাবে দেখি– আমরা যেভাবে দেশের অগ্রগতি দেখছি সেটা আমরা যদি পাকিস্তান কিংবা শ্রীলঙ্কার দিকে তাকাই সে হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক শক্তিশালী। সম্প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে, আমরা হয়তো শ্রীলঙ্কা হবো না। সেটা আমি পরিপূর্ণ বিশ্বাস করি কিন্তু এনজিওদের দ্বারা যে কাজগুলো হওয়ার কথা ছিল সেখানে মনে হয় যে আমরা সম্পূর্ণ সফল হতে পারিনি। এখনো যদি গ্রামে যান তা হলে দেখবেন যে অনেক পরিবারের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সরকারও স্বীকার করছেন যে প্রায় ৩ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে এবং এটা কিন্তু আরো নেমে যাবে। কারণ হচ্ছে যে, আমরা মনে করছি কোভিড চলে গেছে কিন্তু কোভিডের ইফেক্টে কতো লোক যে চাকরি হারিয়েছে, কত ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক প্রবাসী যারা মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করতেন তারা দেশে ফিরে এসেছেন।

আমার তো মনে হয় যে, এখানে কাজ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। আমার মূল্যায়ন হচ্ছে যে, আমরা পরিপূর্ণভাবে আমাদের দায়িত্বটা পালন করতে পারিনি। এই দায়ভারটা কিন্তু এনজিওদের নিতে হবে। কেননা আমরা সবসময় বলে আসছি যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের নিয়ে আমরা কাজ করছি কিন্তু বাস্তবে তাদের অবস্থাতো আমরা ফেরাতে পারিনি।

আমাকে একটা জিনিস খুব ভাবায় যে, মেডিকেল কলেজ, বুয়েট এর মতো ভালো ভালো যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে সেখানে গরিবের ছেলেমেয়েরা চান্স পায় খুব কম। আমি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হিসেবে খুব সহজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছি, কিন্তু এখন আমার মেয়েকে মেডিকেলে ভর্তি হতে গেলে প্রতি মাসে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা টিউশন ফি দিতে হবে। এটা তো একটা গরিব পরিবার দিতে পারবে না। এই সমতা যতদিন না আসবে সমাজে

বিশৃঙ্খলাটা ততো বাড়বে। কারণ, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে এখন সম্পদ, লেখাপড়া সবকিছু এখন তাদের দখলে চলে গেছে। পৃথিবীর কোনো দেশই এভাবে চলতে পারে না।

প্রত্যয় : নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি এখন বেশ আলোচিত। আপনাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন কতোটা করতে পারছেন?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : মাইক্রোফাইন্যান্স বা সোশ্যাল কাজের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই আমরা ৫০:৫০ ভাগ নিয়োগ দিতাম। আমার কাছে মনে হয় যে, মেয়েরা যদি ছেলেদের পাশে এসে না দাঁড়ায় তা হলে আমাদের সংস্থা বাড়বে না। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে মেয়েরাই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে– বলতে গেলে সে জন্যই তাদের ছেলেমেয়েরা এতো ইন্টেলিজেন্ট, লেখাপড়ায় ভালো। এ কারণে ওরা ডমিনেট করতে পারে সমাজকে এবং সেটাই হওয়া উচিত। আমি অবশ্যই চাই যে মেয়েরা এগিয়ে আসুক কিন্তু তার মধ্যে সেই সুযোগটা তাদেরকে দিতে হবে। আমাদের দেশে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের কথা বলা বা সিদ্ধান্তের কোনো সুযোগ ছিল না। আমি মনে করি কোডেক, বুরো বাংলাদেশ কিংবা আশাসহ দেশের এনজিওদের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় তৃণমূল পর্যায়ের নারীরাও এখন সরব। তারা নেতৃত্ব দিতে পারছে, নিজেরা সিদ্ধান্ত দিতেও সক্ষম হচ্ছে।

প্রত্যয় : অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে আপনারা মাইক্রোক্রেডিটও শুরু করেছেন কিন্তু মাইক্রোক্রেডিটের দিকে খুব বেশি অগ্রসর হচ্ছেন না। এটার কি কোনো ফিলোসফি আছে?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : আসলে আমরা খুব ধীরস্থিরভাবে এগোতে চাই। আমাদের মাইক্রোফাইন্যান্স টিমের সদস্যদের সবসময় বলি যে, এটা হচ্ছে বহমান নদীর মতো, এটা স্টপ করে দিলে হবে না, চালু রাখতে হবে। আমাদের স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে যে প্রতিবছর ১০টার বেশি ব্রাঞ্চ বাড়াবো না। এর দুটো কারণ আছে, একটি হচ্ছে যে আমাদের ঋণ নির্ভরতা অনেক কম থাকবে আর যতটুকুই থাকুক না কেন সেটা আমরা ম্যানেজ করতে সক্ষম হবো।

প্রত্যয় : এনজিও সেক্টর দেশের সমাজ উন্নয়নে অনেক ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে, কিন্তু জনগণ খুব একটা জানে না। পাবলিকের সাথে যোগসূত্র স্থাপনে পাবলিকেশন্সের গুরুত্বটা আপনি কীভাবে দেখেন?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : আমি অবশ্যই বলবো যে, পাবলিকেশনের দরকার আছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটার দরকার তা হলো উদাহরণ সৃষ্টি করা। যেমন ধরুন কোনো একটি গ্রাম বা জনপদ সেখানকার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় আমাদের অবদান রয়েছে, আমাদের কাজ দিয়ে স্বনির্ভর করতে পেরেছি এমন একটা জনপদ তৈরি করতে পারিনি। এনজিওরা যদি কোনো একটি এলাকায় একা না হয়ে অন্যদের নিয়ে কাজ করে যদি কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে তা হলে সেটা কিন্তু অনেক বেশি ইফেকটিভ হবে এবং কাগজে লিখলে আজকাল অনেকেই বিশ্বাস করে না। তাই উদাহরণ সৃষ্টি করে যদি সরকারের ডিসিশন মেকারদের জানানো যায়, এই গ্রামের প্রতিটা ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়, একটা লোকও কারো কাছে হাত না পাতে, তা হলে সরকারের লোকজন বলবে হ্যাঁ ওনারা ভালো কাজ করেন। তবে সে রকম এক্সাম্পল আমরা এখনো করতে পারিনি।

প্রত্যয় : এফএনবিকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে আপনার কোনো অভিমত আছে কি না?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : আমরা এফএনবির মেম্বার হয়েছি– কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এফএনবির কোনো পরিকল্পনা আমরা দেখিনি। আমার কাছে মনে হয় যে এফএনবির আরো দৃঢ়ভাবে কাজ করা উচিত এবং তার এজেন্ডাটাও পরিষ্কার করা উচিত। কারণ, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও সেক্টর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এসব কাজ করতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেক্ষেত্রে এফএনবি শক্তিশালী হলে এবং একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মোতাবেক পরিচালিত হলে এ সেক্টরের কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে বলে আমি মনে করি। আমার বিশ্বাস এফএনবির বর্তমান নেতৃত্বের মাধ্যমে এটি সম্ভব হবে।

প্রত্যয় : গত ৩৫ বছর এনজিও সেক্টর বাংলাদেশে কাজ করছে এই সেক্টরের একজন হিসেবে আপনি একে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : এই ৩৫ বছরে আমরা যে খুব অর্জন করতে পেরেছি তা আমার মনে হয় না। গভর্নমেন্ট দিন দিন রুলস-রেগুলেশন দিয়ে আমাদের একটা বেড়াজালের মধ্যে রেখেছে। আগের সেই ভাইব্রেন্ট এনজিও আমি এখন আর দেখি না। এ জন্যই আমি এফএনবির শক্তিশালী নেতৃত্বের কথা বলছি।

প্রত্যয় : এমআরএর রুলস কি আরো পরিমার্জিত দরকার কি না?

ড. কাজী খুরশিদ আলম : এমআর এর রুলসটাই আমি দেখতে পাচ্ছি না। তারা বছরে হয়তো দুবার আসে। এসে বলে যে আপনাদের এটা নেই, ওটা নেই, এটা করেন, সেটা করেন কিন্তু এমআরএ সহযোগিতাটা অন্যভাবেও করতে পারতো। যে আমাদের ক্যাপাসিটিটা কীভাবে বাড়ানো যায় সেদিকে কিন্তু ওনাদের কোনো কাজ আমি দেখি না।

আবার কো-অপারেটিভ অ্যাক্টের অধীনে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে মাল্টিপারপাস প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হচ্ছে জনগণ। এতে আমাদের প্রতিও মানুষের ভুল বোঝার অবকাশ হচ্ছে। এমআরএ কিন্তু সেসব জায়গায় হাত দিতে পারেনি। তাদের এই কাজগুলো আমাদের কাজগুলোকে ব্যাপকভাবে আন্ডারমাইন্ড করছে। অথচ এক সময় এই প্রতিষ্ঠানগুলো হায় হায় কোম্পানিতে পরিণত হয়। কিন্তু সরকার এগুলো বন্ধ করতে পারছে না। আমার মনে হয় এগুলো বন্ধ করে দেয়া উচিত। আমি মনে করি, যারাই মাইক্রোফাইন্যান্স করবে তাদেরকে এমআরএর মাধ্যমেই আসতে হবে।■

আমরা করবো জয়

হৈমন্তী, উষ্ণ ও নিশু।
চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটের উত্তর সলিমপুর জলদাস পাড়ার তিন স্বপ্নবাজ শিশু।
এ গ্রামে ওদের মতো এমন স্বপ্নবাজের সংখ্যা প্রায় শ' খানেক।
কেউ হতে চায় ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ শিক্ষক। কেউ কেউ পুলিশও।
ওদের দৃষ্টিতে, হাসিতে সেই স্বপ্নের নির্ভুল প্রতিফলন। ওরা জয় করতে চায় নিজেদের বোনা স্বপ্নগুলোকে।
ওদের মধ্যে এই স্বপ্নগুলো জাগিয়ে তোলার কাজটি করে যাচ্ছে বেসরকারি সংস্থা CODEC এর নিবেদিত কর্মী ও শিক্ষকেরা।

নির্বাহী সম্পাদক

অপকা। আদিবাসী ও প্রতিবন্ধীদের কাছে আশীর্বাদ

চট্টগ্রামের মীরসরাই এর স্থানীয় একটি উল্লেখযোগ্য বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন অর্গানাইজেশন ফর দ্য পুওর কম্যুনিটি অ্যাডভান্সমেন্ট (OPCA) আদিবাসী ও প্রতিবন্ধীদের জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে বেশ প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর চট্টগ্রামের মীরসরাই এলাকায় বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে ব্যাপকভাবে জানমাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। বিশেষ করে গৃহপালিত পশু-পাখিসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়িঘরের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। ১৯৯১ সালে এমনই এক ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে সমাজ সচেতন মানবদরদী যুবক মোহাম্মদ আলমগীর তার সহযোগীদের নিয়ে ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে মানব কল্যাণে গড়ে তোলেন অর্গানাইজেশন ফর দ্য পুওর কম্যুনিটি অ্যাডভান্সমেন্ট (অপকা)

এ প্রতিষ্ঠানটি আদিবাসী, জেলে সম্প্রদায়, রোহিঙ্গা শরণার্থী, প্রতিবন্ধী, কোস্টাল কমিউনিটি, প্রান্তিক চাষি, নারী, শিশু, ভিক্ষুক, চা শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক এবং পোশাক শিল্প কর্মীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। এটি চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের ডোনার/পার্টনাররা হচ্ছে কেয়ার বাংলাদেশ, ইউনিসেফ, DRRA (জার্মানির DAHW), CIDA, DANIDA-RFLDC, UCEP, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন, অনকূল ফাউন্ডেশন (MDF), সেভ দ্য চিলড্রেন (USAID), BNFE, ঢাকা আহসানিয়া মিশন। অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেদের অর্থও ব্যবহার করে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য অপকা কক্সবাজার-উখিয়া উপজেলায় ৫টি ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে পিকেএসএফ এর ফান্ডে তাদের অনেক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। আমরা প্রত্যয় টিম অপকার এসব উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্দেশে মীরসরাই থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে কালো পাহাড় পর্বত ও ঘন জঙ্গল ঘেরা রাঙ্গুনিয়ার দুর্গম অরণ্যের এক ত্রিপুরা আদিবাসী পল্লীতে যাই। এখানকার আদিবাসী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন নেই। দু'পাহাড়ের মাঝখানের নিচু জমিতে বছরে একবার ধান আবাদ হয়। উঁচু পাহাড়িয়া ঢালু স্থানে তেমন ফসলাদি হয় না।

অপকা এসব স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে গোল মরিচ এর চাষ করছে। প্রাথমিকভাবে ২০ জন চাষিকে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা দেয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে আরো ৩৫০টি প্লট নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি গাছের গোড়ায় সিমেন্টের খুঁটি দেয়ায় লতানো গাছটি ঝাকড়া হয়ে খুঁটি আঁকড়ে রেখেছে। আড়াই বছর পর থেকে ফলন শুরু হয়। আমরা কথা বলি ঝানুরাম ত্রিপুরা ও প্রীতিলতা ত্রিপুরার সাথে। ঝানুরাম ত্রিপুরার বয়স ৬২ বছর। এটা তাদের পারিবারিক জমি। এ বাগানটি প্রীতিলতা ত্রিপুরার নামে। প্রীতিলতা স্থানীয় মহালছড়ি হাই স্কুলের শিক্ষক। স্বামী সুরেশ শান্তি ত্রিপুরা তেমন কিছু করে না। তাদের বড় মেয়ে স্নাতক, আরেক মেয়ে নার্সিং ডিপ্লোমা করে

ভোলায় সরকারি চাকরিতে আছেন এবং ছেলে এসএসসি পাস করেছে।

প্রীতিলতা বললেন, প্রথমে নতুন একটা ফসলের প্রতি আগ্রহ দেখাননি। পরে অপকার নির্বাহী পরিচালক তাদের জানান, এটি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান ফসল। অন্যদিকে দেশে প্রতিবছর মসলা আমদানি করতে হয়। যদি ব্যাপকভাবে এই কর্মসূচি এগিয়ে নেয়া যায়। তবে দেশ এ ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সক্ষম হবে। প্রীতিলতা জানান, গত মৌসুমে তিনি প্রায় ৩০/৩২ হাজার টাকার গোলমরিচ বিক্রয় করতে পেরেছেন। তিনি ও অন্যান্য উপকারভোগীরা অপকাকে ধন্যবাদ জানান।

অপকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সমাজ সচেতনতা কার্যক্রমের ফলে পিছিয়ে পড়া 'ত্রিপুরা' সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। অনেকেরই মন্তব্য, ত্রিপুরা আদিবাসীদের দিন বদলের নায়ক হচ্ছেন অপকার নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আলমগীর। অপকা ত্রিপুরা আদিবাসীদের শিক্ষার আলো প্রদানের লক্ষ্যে মীরসরাই ও ফটিকছড়ির ১২ বর্গকিলোমিটার পাহাড়ি অঞ্চলে ২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গহীন জঙ্গলে বাস করে আদিবাসীরা যেখানে লেখাপড়ার কথা চিন্তাও করতে পারতো না, এসব পরিবারের প্রায় ৯শ' ছাত্রছাত্রী আজ স্কুলে পড়ছে। এসব স্কুল থেকে ৪র্থ শ্রেণি পাস করার পর ৫ম শ্রেণিতে ভর্তির ব্যবস্থাও করেছে অপকা। গত বছর অপকার স্কুলে ২০০০ এর মতো শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছে। বেশিরভাগই আজ হাই স্কুলে পড়ছে। কয়েকজন এসএসসি পাস করেছে। বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রায় ৫০০ জন আদিবাসীকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

অপকা'র ঋণে গোলমরিচ চাষে সফল প্রীতিলতা ত্রিপুরা

প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের পরিবারের নিকট 'অপকা' আশীর্বাদ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। অপকা শুধু মীরসরাই উপজেলার জন্যই নয়, প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও জীবনযাপনের উন্নয়ন কার্যক্রম দ্বারা দেশেই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। অপকা তাদের শুরুর সময় থেকেই অটিজমের শিকার শিশুদের নিয়ে কাজ করছে। জন্ম নেয়া একটি অটিস্টিক শিশু সেই পরিবারের দুর্ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে বাবা মায়েরা দুশ্চিন্তার শিকার হন। কিন্তু প্রতিনিয়ত অনুশীলনের মাধ্যমে এই অটিজম শিশুদের মানসিক বিকাশ, তাদের পড়াশোনা, খেলাধুলাসহ শিক্ষিত ও কর্মমুখীন করার উদ্যোগ নিয়েছে অপকা। প্রতিবন্ধীদের অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য 'অপকা' হাইওয়ের সাথে এক একরের অধিক জায়গা নিয়েছে। ইতোমধ্যেই এখানে অনুশীলন/প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ স্কুল স্থাপন করেছে। ভবিষ্যতে আরো বড় ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার চিন্তা রয়েছে।

এখানে প্রতিবন্ধী অনেক শিশু ও তাদের মাসহ অভিভাবকদের সাথে কথা হলো। অপকা এবং একজন মোহাম্মদ আলমগীরের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই সেন্টারে ৬০ জনের অধিক অটিস্টিক শিশুর নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়। কিন্তু কোভিড এর কারণে অধিকাংশ শিশু বাড়িতে থেকেই পাঠ অনুশীলন করছে।

অটিজম সেন্টারে আসা অনেক অভিভাবক ও শিশুদের সাথে কথা হলো। তাদেরই একজন প্রতিবন্ধী পান্তারানী সূত্রধরের মা দুর্গারানী সূত্রধর। তিনি জানালেন তার মেয়ে পান্তারানীর বয়স এখন ১২ বছর। এক শিক্ষকের পরামর্শে ৪/৫ বছর ধরে এখানে নিয়ে আসছেন। এতে করে তার অবস্থার বেশ উন্নয়ন ঘটছে। এখন সে নিজে নিজেই খেতে পারে। ঘরের কাজেও সহায়তা করতে থাকে। রাবিনা আফরিন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। তার মা আনোয়ারা বেগম বললেন, অপকার দেয়া থেরাপি ও অন্যান্য সহযোগিতার ফলে তার অবস্থা এখন ভালোর দিকে।

এ রকম মেহরাজ, বাবুল ও মীমসহ অন্যান্য শিশুর অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের কথা জানালেন। বললেন, অপকা তাদের জন্য আশীর্বাদ বয়ে এনেছে।■

বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সামাজিক কাজ হয় না

মোহাম্মদ আলমগীর
নির্বাহী পরিচালক
অর্গানাইজেশন ফর দ্য
পুওর কমিউনিটি অ্যাডভান্সমেন্ট (OPCA)

চট্টগ্রামের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (OPCA) অপকার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক ত্রিপুরা আদিবাসীদের দিনবদলের নায়ক মো. আলমগীর এর জন্ম ১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মীরসরাইয়ের জোরারগঞ্জের হাজীসরাই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তার পিতার নাম মরহুম শফিউল্লাহ মিয়া ও মায়ের নাম জরিনা বেগম। ছোটবেলা থেকেই সমাজসেবার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ মো. আলমগীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। ১৯৯১ এর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বন্ধুদের নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে তার মনে হয়েছিল দুঃখী দরিদ্র অসহায় মানুষদের উন্নয়নে স্থায়ীভাবে কাজ করা দরকার। এই প্রেক্ষিতেই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন অপকা। এই প্রতিষ্ঠানটি গড়তে গিয়ে তিনি একসময় মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ে ছুটে বেরিয়েছেন। তার চিন্তা-চেতনা, প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফসল 'অপকা' যা আজ চট্টগ্রামের এনজিও সেক্টরের সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।

অপকায় বর্তমানে ১৬৩ জন তরুণ কর্মী ও ৩৬৫ জন স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছেন। মীরসরাই ও ফটিকছড়ির ১২ বর্গকিলোমিটার পাহাড়ি অঞ্চলে ২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অপকা ক্ষুদ্রঋণ ও প্রতিবন্ধীদের সহায়তার জন্য অটিজম সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে অপকার নির্বাহী পরিচালক ও উন্নয়ন ব্যক্তিত্ব মো. আলমগীর যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো :

সহকর্মীদের সাথে অপকার নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আলমগীর

প্রত্যয় : OPCA চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ এনজিও। আপনি এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক। এটি গড়ে তোলার কাহিনি যদি বলেন–

মোহাম্মদ আলমগীর : ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের সময় আমি ছাত্র ছিলাম। তখন দুর্গতদের জন্য ত্রাণ হিসেবে কিছু খাবার-দাবার এবং পুরাতন কাপড় সন্দীপে বিতরণ এবং চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের অফিসেও প্রদান করি বিচ্ছিন্নভাবে। আমাদের একটা ইয়ুথ টিম সে সময় একত্র হয়ে কাজ করেছি। আমি আগে থেকেই একাধিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলাম। আমি দেখলাম যে, বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সামাজিক কাজ হয় না। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাইরে দারিদ্র্য বিমোচনে কোনো কাজ করে না। তখন তাদের বললাম যে আমি একে সাংগঠনিক রূপ দিতে চাই যেটি দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করবে। তখন এটা এনজিও হবে বা আমার প্রফেশন হবে এমন চিন্তা করিনি। এভাবেই ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়ের প্রেক্ষাপটে ১৯৯২ সালে অপকার জন্ম। আমি মূলত এলাকার একটা ইয়ুথ ডেডিকেটেড টিম নিয়ে নবীন এবং প্রবীণের সংমিশ্রণে এই এনজিওটা প্রতিষ্ঠা করি। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে আমি নিজামপুর কলেজের ছাত্র ছিলাম।

প্রত্যয় : সহকর্মীদের নিয়ে যখন এনজিও প্রতিষ্ঠা করলেন তখন ফান্ড কীভাবে জোগাড় হয়েছিল?

মোহাম্মদ আলমগীর : ওই সময় মীরসরাই বার্তা নামে একটা পত্রিকা ছিল। আমরা কয়েকজন মিলে পত্রিকাটা করতাম। আমি তখন ডেইলি স্টার এবং টেলিগ্রাম পত্রিকায় লিখতাম প্রতিনিধি হিসেবে। মাঝে মধ্যে তারা অল্প কিছু টাকা দিত। একই সাথে আমি 'হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ' নামে একটি সংস্থার এনিমেটর ছিলাম। সেখানে আমি ওদের অনেক ট্রেনিং পাই। প্রথম ফান্ড বলতে একেবারেই পারিবারিক পুঁজি ছিল। আমার আব্বা যখন রিটায়ারমেন্টে গেলেন সেখান থেকে আমি কিছু টাকা নিয়েছি আর পরিবার থেকে বিভিন্ন সাপোর্ট নিয়েছি। ফাইনালি আমাদের কিছু পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিলাম প্রতিষ্ঠানের জন্য। আমি ছাত্রাবস্থাতেই বিয়ে করি, স্ত্রীরও কিছু জমি বিক্রি করেছি ফান্ডের জন্য। মোটকথা পারিবারিক উৎস থেকেই ফান্ডটা জোগাড় করি। এছাড়াও কিছু বন্ধু-বান্ধব নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে।

প্রত্যয় : সে সময় আমাদের দেশে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংকসহ আরো কিছু এনজিও কাজ করছিল। আপনি কি তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তারা যেহেতু এ ধরনের কাজ করছে তাই এনজিওতে ঝুঁকলেন?

মোহাম্মদ আলমগীর : বলতে দ্বিধা নেই যে, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, কারিতাস, চট্টগ্রামের কিছু এনজিওর কার্যক্রম দেখে আমার মনে হয়েছে মানুষের জন্য কাজ করার এটাই সঠিক পথ। একটা প্রতিষ্ঠান যদি গড়ে না তুলি তা হলে দীর্ঘদিন মানব কল্যাণে কাজ করার কোনো সুযোগ পাবো না। এনজিও ছাড়াও কিছু দাতব্য প্রতিষ্ঠান, কিছু পরোপকারী সমাজহিতৈষী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দেখে আমি আসলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রত্যয় : প্রথমদিকে তো আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ জোগাড় করেছেন। এরপর প্রথম ফর্মাল ফান্ডটি কোথা থেকে পেলেন?

মোহাম্মদ আলমগীর : এনজিও সেক্টরের ফর্মাল ফান্ড বলতে যেটি বোঝায় সেটা আমরা পেয়েছি 'কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড' থেকে। এছাড়া প্রথম আমরা কাজ করি কারিতাসের সঙ্গে। তাদের স্যানিটেশন প্রজেক্টের কাজ করেছি। এছাড়া হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ, নিজেরা শিখি, প্রশিকা এদের সাথেও কাজ করেছি।

২০০১ সালে আমরা কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড থেকে দেড় কোটি টাকার প্রথম ফর্মাল ফান্ড পাই। তখন আদিবাসীদের জন্য কাজ করি। শুনে খুশি হবেন যে কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড এর ফান্ড পেয়ে আমরা ২৪টা স্কুল প্রতিষ্ঠা করি আদিবাসী পাড়ায়। আদিবাসী ছেলেমেয়েরা বাংলায় কথা বলতে পারত না, তাদের কথা কেউ বুঝতোও না। স্কুলে গেলে তাদেরকে টিজ করত। তাদেরকে শেখানো ছিল খুবই কঠিন কাজ। সে সময় আমরা আদিবাসীদের মধ্য থেকেই শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। সেই ছেলেমেয়েরাই এখন পুলিশ অফিসার, সাইপ্রাসসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী। আমাদের সেই স্কুল এখনো আছে। তখন পাহাড়ের ভেতর দিয়ে আদিবাসী পল্লীতে

যাতায়াত খুব মসৃণ ছিল না, সব খানাখন্দে ভরা ছিল। অনেক কষ্ট করে আমি ট্রাক নিয়ে সেখানে যেতাম।

প্রত্যয় : আদিবাসীরা এ প্রকল্পটি কীভাবে নিয়েছিল? আপনি স্কুলের বিষয়টি উপস্থাপন করলে তারা কি সেটা গ্রহণ করেছিল?

মোহাম্মদ আলমগীর : না। শুরুতে তারা গ্রহণ করেনি। তারা কিছুতেই পড়তে চায়নি এবং আমিও তাদের কাছে নতুন ছিলাম। পরে আমরা একটি প্রকল্প উপস্থাপন করলাম যে, আমরা আদিবাসীদের একজনকে একটি করে ছাগল দেব; যখন সেটির বাচ্চা হবে তখন সেই ছাগলের প্রথম বাচ্চাটি অন্য আরেকজনকে দিয়ে দেবে। এটির নাম ছিল 'অদল-বদল প্রকল্প'। প্রথমে আমরা ৬৫টি ছাগল দিয়েছিলাম, এরপর আরো ২০০টি ছাগল দেই, যার প্রভাব ছিল অনেক বড়। সেই আদিবাসীদের মধ্যে এখন ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আমার প্রথম কাজটিই ছিল আদিবাসীদের সঙ্গে, তাই এখনো তাদের সাথে সম্পর্ক নিবিড়।

প্রত্যয় : দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আপনারা কোন কোন বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন?

মোহাম্মদ আলমগীর : অপকা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছে প্রায় ২২ বছর যাবৎ। যে মানুষটি চোখে দেখে না, কথা বলতে পারে না– সে তার অভিব্যক্তি কীভাবে কোথায় প্রকাশ করবে? তার যে কষ্ট সে কারো সাথে তার মনের কথা প্রকাশ করতে পারে না। তার কাছে সব কিছুই অন্ধকারাচ্ছন্ন। যে পরিবারে একজন প্রতিবন্ধী বা অটিস্টিক মানুষ থাকে সেই পরিবার এবং ভুক্তভোগী যে কত কষ্টে থাকেন তা কাউকে বোঝানো যাবে না। বিশেষ করে অভিভাবকহীন প্রতিবন্ধীদের সমস্যার তো শেষ নেই। কে দেখবে তাদের? অবশ্য মানুষদের দোষ দিয়েও লাভ নেই। কারণ সে তার পরিবার এবং নিজের সন্তানদের দেখবে, না প্রতিবন্ধীদের দেখবে? সে জন্যই আমাদের অবস্থান থেকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। সেটি হচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজ। এই বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে না পারলে দেশ অনেক পিছিয়ে যাবে। একটি পরিবারে একটি ছেলে বেকার থাকা মানে অভিশাপ। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু করতে না পারার হতাশা থেকে সে ছেলেটি নানা রকম আসক্তিতে আচ্ছন্ন থাকে। তখন তাকে পাহারা দিতে হয়। তাই এই বেকার তরুণদের জন্য আমরা ভোকেশনাল স্কুল শুরু করেছি যেখান থেকে তারা হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে। দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি এই দুটি কাজকে অর্থাৎ অটিজম এবং ভোকেশনাল স্কুলকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি এ মুহূর্তে।

প্রত্যয় : আপনাদের এসব কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য-সহযোগিতা কতোটা পাচ্ছেন? এসব অর্থ ব্যয়ে আপনারা সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কীভাবে নিশ্চিত করে থাকেন?

মোহাম্মদ আলমগীর : দেখুন, যেকোনো কাজেই বিশেষ করে অর্থসংশ্লিষ্ট কাজে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অবশ্য অবশ্য পালনীয়। আমরা মাঠ পর্যায়ে গুরুত্বসহকারে মনিটরিং করি। তাছাড়া প্রতিবছরই আমাদের কার্যক্রম এবং ব্যয়ের বিষয়টি অডিট করা হয়ে থাকে।

প্রত্যয় : এনজিও কার্যক্রমের পাশাপাশি আপনারা ক্ষুদ্র অর্থায়নও করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আপনারা কোন কোন খাতে ঋণ প্রদান করছেন। আপনি কি মনে করেন দেশের তৃণমূল মানুষের উন্নয়নে সক্ষম এমএফআইদের দ্বারা দেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন?

মোহাম্মদ আলমগীর : আমরা বেশিরভাগ ঋণ দিয়ে থাকি এগ্রোবেজড প্রজেক্টে। যেমন– গোল মরিচ, মসলা, গরু মোটাতাজাকরণ, হ্যান্ডলুম প্রভৃতি খাতে। আর আমি মনে করি, দেশের তৃণমূল মানুষদের উন্নয়নেই 'ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি আমাদের এনজিও সেক্টরের যে এফডিআর আছে সে এফডিআর ভেঙে ৫টা ব্যাংক করা সম্ভব। যেখান থেকে শুধু এনজিওগুলোকে ঋণ প্রদান করা হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি যাওয়া উচিত এবং এনজিও খাত সম্পর্কে তার বিরূপ ধারণা বদলে দেয়া উচিত। তাকে আমাদের বোঝাতে হবে যে গ্রামীণ ব্যাংক আর এনজিরা এক না। দেশের উন্নয়নে বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্রদের ঋণ দিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার ব্যাপারে এনজিও খাতের অবদান প্রায় ৭০%।

প্রত্যয় : দেশ ইতোমধ্যে 'নিম্ন মধ্যম আয়ের' দেশে পরিণত হয়েছে এবং সম্প্রতি বাংলাদেশ এসডিজি অগ্রগতি বিষয়ক সম্মাননা লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে এনজিও খাতের অবদান কতোটা বলে আপনি মনে করেন?

মোহাম্মদ আলমগীর : আমি মনে করি এ খাতে এনজিও খাতের অবদান ৭৫% এর বেশি।

প্রত্যয় : ভবিষ্যতে অপকাকে আপনি কোন পর্যায়ে দেখতে চান?

মোহাম্মদ আলমগীর : বর্তমান অবস্থান থেকে আরো বড় ধরনের উত্তরণে যেতে অপকার বেশিদিন সময় লাগবে না বলে আমি আশাবাদী। বর্তমানে আমাদের শাখা ১৫টি। আগামী বছর দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং নেপালে একটা ব্রাঞ্চ করার কথা আছে। নেপালে শাখা খোলাটা হবে অপকার জন্য বিরাট অর্জন।

আরেকটা ইচ্ছা আছে যে, অটিজম সেন্টার এবং ভোকেশনাল স্কুলটাকে বিশ্বমানের করা। ফলে যে কোটি কোটি বেকার আছে তারা যেন কর্মসংস্থানের ঠিকানা খুঁজে পায় এবং তারা যেন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশে তাদের

কর্মসংস্থানের সুবাদে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসবে। রেমিট্যান্সের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে। দেশ আর্থিকভাবে আরো শক্তিশালী হবে এবং তাদের পরিবারের অভাব-অনটনও দূর হয়ে সাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করার সুযোগ পাবে। যুব সমাজ অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকবে। মূলত এই স্পিরিটটাকে আমি কাজে লাগাতে চাই।

প্রত্যয় : আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানকে স্বাবলম্বী করার কি উদ্যোগ নিয়েছেন? বিদেশি অনুদান না পেলে অপকাকে কীভাবে এগিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করছেন?

মোহাম্মদ আলমগীর : এ ব্যাপারে আমাদের একটি বড় পরিকল্পনা রয়েছে। পিকেএসএফ থেকে আমরা এবার যে ফান্ড পেয়েছি সেটি দিয়ে আমরা মসলা উৎপাদন করে এবং কসমেটিকস তৈরি করে সারা বাংলাদেশে বিপণন করব। আমাদের সদস্যদের মাধ্যমে পাহাড়ি মানুষরা বাজারজাত না করতে পেরে অনেক লেবু ফেলে দেয় এছাড়া অন্যান্য ফলও পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আমরা এই লেবু থেকে জুস তৈরি করে ক্যানজাত করব এবং ফলগুলো প্রসেস করে বিদেশে রপ্তানি করার পরিকল্পনা রয়েছে। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে ১শ'টা এন্টারপ্রাইজ লাগে না। ব্র্যাক মাত্র ১টা আড়ং দিয়ে উঠে গেছে। আমরা যদি এই মসলাটাকে প্রসেস করে ব্র্যান্ডিং করতে পারি তা হলে ব্র্যাককে আমরা ডিঙিয়ে যেতে পারব। আমার উইং আছে, আমি যদি প্রতিটি এনজিওর হেল্প নেই, প্রতিটি ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দেই এবং গ্যারান্টি সহকারে সুলভ মূল্যে দেই তা হলে এটা অবশ্যই বড় কিছু হবে।

প্রত্যয় : আপনারা কি কোনো বিজনেজ প্ল্যান দাঁড় করিয়েছেন– সেটা কীভাবে? আর পিকেএসএফ থেকে কত ফান্ড পেয়েছেন?

মোহাম্মদ আলমগীর : হ্যাঁ। আমরা বিজনেস প্ল্যান করেছি। পিকেএসএফ আমাদেরকে ২ কোটি টাকার একটি ফান্ড দিয়েছে মসলা প্রজেক্টের জন্য। তবে এই প্রজেক্টের জন্য আমরা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে যাব। এটাকে আমরা বড় ধরনের এন্টারপ্রাইজে রূপ দিতে চাচ্ছি। বাংলাদেশে প্রথম আমরা গোল মরিচের চাষ করেছি এর আগে বাংলাদেশে কেউ গোল মরিচের চাষ করেনি এবং এটার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা আমাদের বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে দেশের বাইরে নেপালে যাওয়ার কথা ভাবছি।

প্রত্যয় : আপনি নেপাল যাচ্ছেন, বুরোও এক সময় বিদেশে শাখা খোলার কথা চিন্তা করেছিল। এছাড়া ব্র্যাক এবং আশা তো বিদেশে শাখা খুলেছেই। বাংলাদেশের এনজিওদের ক্ষেত্রে দেশের বাইরে যাওয়ার গুরুত্ব আছে কি?

মোহাম্মদ আলমগীর : নেপালে যাওয়ার গুরুত্ব হচ্ছে ২টা ব্যাপারে। আমার উদ্দেশ্য হলো– নেপালের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন করাই শুধু নয়, আমি দেখবো যে তারা কি করে এগোচ্ছে, তাদের এগ্রোবেজড টেকনোলজি ট্রান্সফরম, তাদের ব্র্যান্ডিং কৌশল কি? সেটা আমরা শিখে এখানে কাজে লাগাতে পারব।

আমরা ছোট এনজিও। ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড পেলে আমরা নেপাল যাবো। বুরোর মতো বড় প্রতিষ্ঠান ইচ্ছে করলে নেপালে ২ বছরের জন্য পাইলট প্রজেক্ট করতে পারবে, তাদের সে সামর্থ্য আছে। অপকা পারবে না। নেপালে আমরা যে অফারটা পেয়েছি বুরো যদি আমাদেরকে হেল্প করে তা হলে বুরো-অপকা জয়েন্ট ভেঞ্চারে একটা প্রজেক্ট করা যেতে পারে।

প্রত্যয় : এফএনবি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এফএনবির সদস্য হিসেবে আপনার প্রত্যাশা কি?

মোহাম্মদ আলমগীর : অপকা এফএনবির সদস্য। এফএনবির বর্তমান নেতৃত্বে রয়েছেন জাকির ভাই। তিনি খুব ভালো মানুষ, একজন ডায়নামিক লিডার এবং সাহসী। তিনি যদি এফএনবিকে গতিশীল করার ব্যাপারে আন্তরিক হন তা হলে আমরা যারা এফএনবির সদস্য তারাসহ পুরো এনজিও সেক্টর উপকৃত হবে। বর্তমানে এফএনবির সে রকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ দৃশ্যত চোখে পড়ছে না। আমি মনে করি আমাদের লিডার জাকির ভাই সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন। এফএনবির কার্যক্রমে বার্ষিক কর্মসূচি তুলে ধরতে হবে। আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আমি আশা করছি, বর্তমান চেয়ার জাকির ভাইয়ের নেতৃত্বে এফএনবি এনজিওদের প্রাণের সংগঠনে পরিণত হবে।■

অপকা'র গোলমরিচ বাগানে কাজ করছেন আদিবাসী

মুক্তিযোদ্ধার কবর রাজাকারের পাশে হতে পারে না

বীর মুক্তিযোদ্ধা
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু

ঠাকুরগাঁওয়ের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু ১৯৭১ সালে দেশমাতৃকাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। তার পিতার নাম মরহুম ডা. কুতুবউদ্দিন আহমদ এবং মা মরহুম মহসিনা বেগম। তাদের স্থায়ী নিবাস ঠাকুরগাঁও সদরের আশ্রমপাড়া। তিনি স্কুলের ছাত্র থাকাকালীনই ছাত্রলীগ রাজনীতির সাথে সক্রিয় ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। স্বাধীনতার পর তিনি দিনাজপুরের কেবিএম কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৪-৭৫ সালে তিনি জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৮৯ সালে জেলা যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি বঙ্গবন্ধুপুত্র শেখ কামালের অনুপ্রেরণায় ঠাকুরগাঁওয়ে শাপলা কুড়ি আসর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শাপলা নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ও টাঙন ক্রীড়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বর্তমানে তিনি ঠাকুরগাঁও জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি। বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু যুদ্ধকালে ৬নং সেক্টর কমান্ডার এমকে বাসার এর অধীনে যুদ্ধ করেন। প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি মুক্তিযুদ্ধের যে স্মৃতিচারণ করেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : ঠাকুরগাঁও বাংলাদেশের সর্বউত্তর সীমান্তবর্তী জেলা। আপনি এখানকার একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। আপনার কাছে এখানকার মুক্তিযুদ্ধের শুরুটা জানতে চাচ্ছি।

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু : এপ্রিলের ৯ তারিখে নকুল চন্দ্র রায় নামে দলীয় একজনের বাসায় আমরা দাওয়াতে ছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার এক পর্যায়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। এমন সময় (রাত তখন ১২টা) আশপাশে দরজা ধাক্কানোর শব্দ শুনতে পেলাম। বন্ধুরা মিলে শব্দের উৎস খোঁজার জন্য নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে বের হলাম। চৌরাস্তায় এসে দেখি দুজন বিডিআর একটি বাড়ির দরজায় ধাক্কাচ্ছে। আমরা ঘটনা জানতে চাইলে তারা বলল ভাই আমরা বিডিআর, দুদিন ধরে অভুক্ত। আমরা রিভল্ট করেছি। আমরা এমপি সাহেবকে খুঁজছি।

আমি বললাম, আপনারা আমাদের সাথে চলেন। তখন আমাদের এমপি ছিলেন ফজলুল করিম সাহেব (পরবর্তীতে জেলা গভর্নর)। আমরা বিডিআর দুজনকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলাম। তিনি জানতে চাইলে বললাম, ওনারা বিডিআর। সুবেদার মেজর কাজিমউদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে ওনারা রিভল্ট করেছে। তার কাছেই অস্ত্র ভাণ্ডারের চাবি ছিল। সঙ্গত কারণেই বাঙালি ইপিআরদের ওরা মারতে পারেনি।

অস্ত্রগুলো আগেই কাজিমউদ্দিন সাহেব বাঙালি সৈন্যদের দিয়ে বের করে ফেলেছিলেন। তখন ফজলুল করিম সাহেব পেল্টু বাবু নামে এক মিষ্টির দোকানিকে ডাকতে বললেন। তাকে আনার পর জিজ্ঞেস করলেন তোমার দোকানে কি আটা আছে? পেল্টু বাবু বললেন আছে। কালকে পুরি বানানোর জন্য এনেছি। এমপি সাহেব বললেন, কালকে বানাতে হবে না আজ রাত থেকেই রুটি বানাও। এমপি সাহেবের নির্দেশে রুটি বানানোর পর আমরা ছাত্রলীগের ছেলেরা রামদারা (দিনাজপুরের মহারাম খালের দিনাজপুর থেকে ঠাকুরগাঁও পর্যন্ত) খালের নিচে নেমে শুকনো রুটি/চিনি বিডিআরদের দিয়ে আসলাম। আমরা তখন এসব কাজ করেছিলাম। আমরা তখনো মুক্তিযোদ্ধা না। বিডিআর কমান্ডার যখন বুঝলো যে, এখানে বাঙালি বেশি, তখন দিনাজপুর এবং সৈয়দপুর থেকে আরো কিছু ইপিআর নিয়ে এসে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করলো। তাদের পরামর্শেই আমরা তখন ভাতগা ব্রিজের কাছে গিয়ে রাস্তা খুঁড়লাম যেন পাকিস্তানি হানাদাররা ট্যাংক নিয়ে শহরে প্রবেশ করতে না পারে।

যাই হোক, সৈয়দপুরে আর্মিরা এসে সৈয়দপুর খালের ওপর গাড়ি পার করার জন্য বেইলি ব্রিজ তৈরি করলো এবং একই সাথে ঠাকুরগাঁওয়ের দিকে শেল নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। আমরা

টিকতে না পেরে সেখান থেকে ব্যাক করে ফজলুল করিম সাহেবের বাসায় এসে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করলাম।

এপ্রিলের শেষের দিকে পাক আর্মি ঠাকুরগাঁও শহর দখলে নেয়ার ফলে আমরা শহরে থাকতে পারলাম না। তখন আমরা পুরো পরিবার নিয়ে চলে গেলাম বর্ডারের কাছে। পঞ্চগড়ের কাছে মীরগড় নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে ছিল আমার বড় ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি। আমরা সেখানে কয়েকদিন ছিলাম। আর্মিরা ঠাকুরগাঁও দখল করে যখন পঞ্চগড়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো তখন আমরা ভারতের পাশে চান্দাপাড়া নামে একটা জায়গায় গেলাম। আমরা ৪/৫ জন এক সাথে ছিলাম। আমাদের সাথে একজন বিডিআরও ছিল। আমরা চান্দাপাড়ায় যার বাসায় ছিলাম তার নাম ছিল রইস উদ্দিন। আমরা জানতাম না সে খুব খারাপ মানুষ। কদিন যাবৎ সে আমাদের সম্পর্কে বিভিন্ন খোঁজখবর নিয়েছে।

আমাদের কাছে কিছু সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ছিল। ওই লোক বাংলাদেশ এবং ভারতের কিছু চোরদের নিয়ে এসে আমাদের ওপর হামলা চালালো, ডাকাতি করে সব মালামাল নিয়ে গেল। সেই বয়সেই আমি ডাকাতদের সাথে মারামারি করেছি। আমাদের সাথে অস্ত্রসহ একজন বিডিআর থাকার কারণে তারা আমদের বেশি ক্ষতি করতে পারেনি এবং তারাই ভারতে ইন্ডিয়ান ক্যাম্পে খবর দিয়েছে। তখন ইন্ডিয়ান ক্যাম্প থেকে কয়েকজন বিএসএফ এসে আমাদেরকে বলল, আপনাদের দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন চলছে, কিন্তু আমাদের দেশটা তো স্বাধীন। এখানে আপনি অস্ত্র রাখতে পারবেন না। বরং আমরা মেমো দিচ্ছি আপনারা এখানে জমা রাখুন। যখন প্রয়োজন হবে, তখন নিয়ে যাবেন। অথবা যুদ্ধে যদি প্রয়োজন হয় তা হলে বাংলাদেশে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু আমাদের এখানে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন না।

যাহোক তাদের কথা মতো মেমো নিয়ে যেদিন রাইফেল জমা দেয়া হলো, সেদিন রাতেই আবার ডাকাতি হলো। এতদিন শুধু অস্ত্রের ভয়ে করতে পারেনি। তখন আমার বাবা ছিলেন এমএলএফ ডাক্তার। তিনি মুরুব্বী হওয়ায় রোগী দেখার নাম করে মহিষের গাড়িতে করে তাকে নিয়ে ওদের একজন অন্য জায়গায় চলে গেছে। তাদের প্ল্যান ছিল বাবাকে মেরে ফেলবে। আমার একটু সন্দেহ হচ্ছিল যে সত্যি সত্যি রোগী দেখতে যাবে, না অন্য কোনো কারণে? তাই আমি বিডিআর লোকটিকে বাবার সাথে পাঠালাম।

এরপর তারা ডাকাতি শুরু করল এবং আমাকে কোপাতে লাগলো। আমি সব হাত দিয়ে ঠেকিয়েছি। এক পর্যায়ে একজন ডাকাতের মাথায় লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করি। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল, বাকি দুজন ঘরের বাইরে চলে গেল। সেই মুহূর্তে আব্বাকে নিয়ে ইপিআর লোকটি চলে এলো এবং বললো, আব্বাকে তারা হত্যার উদ্দেশে নিয়ে গিয়েছিল। তখন সে-ও ডাকাতদের ধাওয়া করল। তারপর সেখান থেকে বাংলাদেশের মীরগড়ে দৌড়ে আসলাম, সেখানে কিছু বাংলাদেশি স্বেচ্ছাসেবক পেলাম। তাদের কাছ থেকে একটা রাইফেল নিয়ে ফাঁকা আওয়াজ করলাম যাতে ডাকাতরা চলে যায়। নদীর ওপারে দেখলাম যে ডাকাতরা মিটিং করছে আমি ইপিআরকে বললাম, ভাই আমি একটা ডাকাতকে ঘরের মধ্যে বেধে রেখেছি। কাজেই ওরা আবার হামলা করতে পারে। তুমি তো ভাই ইপিআর, তুমি কোনো ব্যবস্থা নাও। তখন সে বাংলাদেশের মীরগড় থেকে লুট হওয়া দুটো রাইফেল নিয়ে এসে আমাকে একটা দিয়ে গুলি করা শিখিয়ে দেয়। আর সে একটা নেয়। পরে ডাকাতরা আর কাউন্টার অ্যাটাক করেনি।

তখন আমরা বিএসএফকে খবরটি দিয়ে ডাকাতটিকে তাদের হাতে তুলে দিলাম। বিএসএফদের মধ্য থেকে একজন বলল, যেহেতু একজন ডাকাত ধরা পড়েছে তখন আপনাদের মালামাল আমি বের করে দেব। এরপর তদন্ত করে দেখা গেলো বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার চোররা মিলে মালামালগুলো ভাগ করে নিয়ে গেছে। বিএসএফের লোকটি বলল ভাই আমাদের মালগুলো উদ্ধার করতে পারব কিন্তু আপনাদের দেশেরগুলো পারব না। দুদিনের মধ্যেই অর্ধেক মাল সে উদ্ধার করে দিয়েছে। এরপর আমার হাতের ট্রিটমেন্টের জন্য আমি জলপাইগুঁড়ি আসি। সেখনে জলপাইগুড়িতে একটা হাসপাতালে সপ্তাহখানেক ট্রিটমেন্ট নেয়ার পর হাত কিছুটা ভালো হওয়ার পর আমি ফিরে আসি। আমি বাবা-মাকে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কথা বলিনি। কারণ বললে তারা যেতে দেবে না। তাই এমপি ফজলুল করিম সাহেবকে বললাম যে আমি মুক্তিযুদ্ধে যেতে চাই।

প্রত্যয় : আপনি এমপি ফজলুল করিম সাহেবকে কোথায় পেলেন?

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু : আমি তাকে পেয়েছি ইন্ডিয়াতে। আমার বাবা-মা যেখানে ভাড়া থাকতেন তার পাশেই তিনি থাকতেন। আমার বাবাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ক্যাম্পের। তিনি বাবাকে বললেন, বাংলাদেশের যারা শরণার্থী আছে তাদের ওষুধপত্র আমি সব কিনে দেব। আপনি শুধু তাদের সেবা শুশ্রূষা করবেন। ইসলামপুরের পাশে রামগড়ে যে শরণার্থী শিবির ছিল সেখানে আমার বাবা থাকতেন এবং পাশেই ফজলুল করিম সাহেব থাকতেন। এরপর ফজলু চাচাকে বলে আমি ট্রেনিংয়ে চলে গেলাম।

প্রত্যয় : এই ট্রেনিং ক্যাম্পটি কোথায়?

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু : এই ক্যাম্পটি ছিল শিলিগুঁড়িতে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং হতো। জায়গাটির নাম ছিল পানিঘাটা।

প্রত্যয় : আপনার কি শুরু থেকেই টার্গেট ছিল যে আপনি ট্রেনিংয়ে যাবেন? আর যাওয়ার পথেই কি এসব ঘটনা?

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু : হ্যাঁ, বিষয়টি তাই। আসলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্যই আমার ইন্ডিয়াতে আসা।

প্রত্যয় : আপনার কোম্পানি কমান্ডার কে ছিলেন? ট্রেনিং ক্যাম্পে ঠাকুরগাঁওয়ের পরিচিত কতজনকে পেলেন?

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু : আমার কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন জিন্নাহ ভাই। পানিঘাটার ক্যাম্পে ট্রেনিং চলাকালীন পরিচিত দুজনকে পেয়েছি। একজন আক্তার হোসেন অন্যজন নারু দাশ। এ দুজন মুক্তিযোদ্ধা। পালামু নামে আরেকটা ছেলেকে পেয়েছিলাম। সে মুক্তিযোদ্ধা ছিল না। ঠাকুরগাঁওয়ের এক সুইপারের ছেলে। সে এই ক্যাম্পে ঝাড়ু দিত। সেখানে ২১ দিন ট্রেনিং হয়েছিল। ট্রেনিং শেষ করে আমরা ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

প্রত্যয় : সেখানে ইন্ডিয়ান যিনি ট্রেনিং দিতেন তার নাম কি মনে আছে?

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু : তার নাম ছিল শর্মা। আমরা তাকে ওস্তাদ ডাকতাম। তিনি আর্মির লোক ছিলেন তবে অফিসার র‌্যাঙ্কের না। আমরা যখন দেশে ফেরার চিন্তা করলাম ঠিক সেই সময় নর্থ বেঙ্গলের সবচেয়ে প্রভাবশালী এমপি সিরাজুল ইসলাম, তিনি কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক সম্পাদকও ছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা ছাত্রলীগের ছেলে। এই ট্রেনিংয়ে হবে না, তোমাদেরকে হায়ার ট্রেনিংয়ে যেতে হবে। হায়ার ট্রেনিংয়ের দুটো ক্যাম্প ছিল। একটি হলো দেরাদুন ক্যান্টনমেন্ট আর অন্যটি আমাদের হাপলং-এ।

আমাদের গ্রুপকে দুই ভাগ করে এক ভাগ পাঠানো হলো দেরাদুন এবং অন্যভাগ হাপলং-এ। আমরা এলাম হাপলং-এ। আমরা দেরাদুন থেকে প্রথমে শিলচর গেলাম। সেখান থেকে আমরা ট্রেনে গেলাম। আমরা ওখানকার যে ট্রেনে উঠলাম তার দুটি ইঞ্জিন একটি সামনে থেকে টানছে অন্যটি পেছন থেকে ঠেলছে। কারণ, ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের উপরে উঠতে হয় যাতে স্লিপ না কাটে। মাঝে মাঝে ওস্তাদ বলতেন, জানালা বন্ধ করে দাও বৃষ্টি আসবে। পাহাড়ের অনেক ওপরে ওঠার কারণে জানালা দিয়ে মেঘ ঢুকে আমাদেরকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। সেটি এক বিরাট অভিজ্ঞতা। এরপর আমরা থাগলচঙ্গা নামে একটি স্টেশনে গিয়ে পৌছলাম। সেখান থেকে আমাদেরকে গাড়িতে করে আস্তে আস্তে পাহাড়ের ওপরে ওঠানো

হলো। থাগলাচঙ্গায় একটি মার্কেট আছে যেখানে বিক্রেতারা ছিল সব মহিলা। সেখানে আমরা চা খেয়ে ক্যাম্পে চলে এলাম।

পরদিন শুরু হলো আমাদের ট্রেনিং। সেখানে আমরা শিখলাম ওয়্যারলেস ট্রেনিং, কীভাবে রাস্তা অক্ষুণ্ন রেখে বোম নিক্ষেপ করা যায়। কীভাবে ব্রিজ ধ্বংস করা যায় এসব। আমাদের গেরিলা ট্রেনিং এর যিনি প্রধান ছিলেন তার নাম ছিল জেনারেল ওবান। ট্রেনিং শুরুর দিন তিনি প্রথমে স্বাগত বক্তব্য দিলেন। বললেন, তোমরা মাত্র দেড় মাস ট্রেনিং নিয়ে পাকিস্তানের মতো একটি দেশের সুশৃঙ্খল বাহিনীর সাথে কীভাবে যুদ্ধ করবে? তবে ভয়ের কিছু নেই ওরা এসেছে তদের চাকরি বাঁচানোর জন্য– আর তোমরা যুদ্ধ করছ দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য। জয় তোমাদের হবেই। এই বক্তব্য আমাদের সাহস বাড়িয়ে দেয়। জলপাইগুঁড়ির পাঙ্গা অপারেশন ক্যাম্পে আমার পরিচয় ঘটে তাত্ত্বিক নেতা সিরাজুল আলম খানের সাথে। তিনি আমাকে মুজিব বাহিনীর সদস্য করেন।

আমরা ৭দিন ট্রেনিং নিলাম পাহাড়ে ওঠা-নামার এবং এটা করতে করতে আমাদের পা ফুলে গিয়েছিল। ওস্তাদ বলতেন চিন্তা করবা না। তোমার অভ্যাস নাই, প্রথমে এমন একটু হবেই। ৭ দিন পর ঠিক হয়ে যাবে। দুমাসের ট্রেনিং শেষ করে আমরা চলে এলাম। তখন আমার পোস্টিং ছিল কুচবিহারের পাশে দহগ্রাম, হাতিবান্ধা, পাটগ্রাম। সেখানে গিয়ে আমার সমস্যা হলো যে আমি রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা জানতাম না এবং সাঁতারও জানতাম না। একবার আমি নৌকায় করে অপারেশনে যাচ্ছিলাম, কাঁশবনের কাছে এসে পাকিস্তানি আর্মিরা অ্যাম্বুশ করল, আমাদের কপাল ভালো যে আমরা ফায়ারিং রেঞ্জের বাইরে ছিলাম। পাকিস্তানিদের লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিতে আমরা সতর্ক হয়ে যাই এবং নৌকার ওপর শুয়ে পড়ি ফলে নৌকার একপাশে চাপ বেশি পড়ে উল্টে যায়। নৌকায় আমাদের সমস্ত অস্ত্র-গোলাবারুদ যা ছিল সব পানিতে তলিয়ে গেল। তখন আমি যে সাঁতার জানি না সেটা রংপুরের বন্ধুরা জানত না। আমি ডুবছি আর পানি খাচ্ছি। তখন একটা ছেলে অনুমান করে ওপরে উঠে আমাকে বলল দোস্ত, এই খুটাটা ধর। আমি প্রাণপনে খুটাটা ধরার পর ওরা পাড়ে উঠে আমাকে অনেক কষ্টে টেনে তুলেছে। এরপর কি হলো আমি আর বলতে পারিনি। এরপর ক্যাম্পে ফিরে এলাম। আমরা যে মরিনি সেটা বড় কথা নয় বরং অস্ত্র গোলাবারুদ যে পানিতে তলিয়ে গেল এটা অনেক বড় অপরাধ। যে কারণে ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদেরকে ৩ দিন শাস্তিস্বরূপ খাবার দেয়নি। অনেক খারাপ বকা দিয়েছে। বলেছে, তুমি মরলা না কেন? হাতিয়ার কেন ফেলে আসলা?

আমাদের বিগ বস ছিলেন বাংলাদেশের সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান এম. কে. বাশার। তিনি কলকাতায় এক সেমিনার থেকে ফিরে আমাদের দেখে বললেন, কি ব্যাপার তোমাদের হাত কেটে গেছে, রক্ত ঝরছে! কি হয়েছে? তখন আমরা সব ঘটনা তাকে খুলে বললাম। ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদেরকে খাবার দেয়নি, পাথরের মধ্যে ক্রলিং করিয়েছে যে কারণে হাত পায়ের এ অবস্থা। তিনি সব শুনে ইন্ডিয়ান মেজর, সিপাহীদের ভয়াবহ রকমের গালি দিলেন। তিনি অফিসারকে বললেন, আপনি কি বাংলাদেশের ছেলেগুলোকে ইন্ডিয়ান আর্মি মনে করেছেন? ওদেরকে কি বেতন দেন? ওরা জীবন বিসর্জন দিয়ে স্বেচ্ছায় দেশের জন্য লড়তে এসেছে। ওদের সাথে আপনারা খুবই অমানবিক কাজ করেছেন।

তিনি আমাকে বললেন যে, বাবলু তোমাকে একটা ভালো সাজেশন দেই। তুমি তোমার হোম ডিস্ট্রিক্টে যাও, ওখানে নদী নেই, ভাষার সমস্যা নেই। সেখানে গেলে তুমি ভালো করবা। আমি তোমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। আমি সেখান থেকে আসলাম ইন্ডিয়ান কোটগজ ক্যাম্পে। সেখান থেকে লড়াই করতাম। পঞ্চগড়ের জগদ্দল যেতাম। সেখানে অপারেশন করেছি।

প্রত্যয় : রণাঙ্গনের একটি ঘটনা বলেন, যেটি বলার জন্য আপনার আগ্রহ জাগে?

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু : আমি ট্রেনিংয়ের মধ্যে ছিলাম। লড়াই করলাম। ৬ মাস আমার বাবা-মায়ের সাথে দেখা পাইনি। কোটগজে আসার পর মেজর সাহেবকে বললাম স্যার আমার বাবা-মা করিমগঞ্জে থাকে, যদি দুদিন ছুটি দেন তা হলে আমি তাদের সাথে দেখা করে আসতে পারতাম। যুদ্ধে বাঁচবো না মরবো তা তো বলতে পারি না। তিনি বললেন ঠিক আছে, তুমি যাওয়ার আগে দুটো অপারেশন করে যাও– যদি সাকসেসফুল হও তা হলে যাবে।

প্রতিদিন সকালে ৪ জন পাকিস্তানি সৈন্য ও দুজন অফিসার পঞ্চগড় থেকে জগদ্দল পর্যন্ত ভিজিটে বের হয়। আমাদের ভারতীয় স্যার বললেন, এই জিপটা উড়িয়ে দিতে হবে। তোমরা রেকি করে আস। এরপর আমরা রেকি করে অপারেশনের প্রস্তুতি নেই। আর পঞ্চগড় যেতে নইনি ব্রিজটা ভাঙতে হবে। সেখানে লড়াই করে ডিফেন্সের লোকদের সরিয়ে কাজটি করতে হবে।

আমরা টার্পিডো বোম দিয়ে ধান ক্ষেত থেকে জিপটি উড়িয়ে দিলাম। ১৪ হাত ওপর থেকে জিপটি নিচে পড়ে গেল। ৪ জন তখনই মারা গেল। একজন কোনোমতে বের হলে তাকে জীবন্ত ধরে নিয়ে আসলাম। এরপর আমরা নইনি ব্রিজের এক অংশ এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দিলাম। এই স্মৃতি এখনো মনে দাগ কাটে। তবে সবচেয়ে বেশি স্মৃতিতে ভেসে ওঠে যে ঘটনাটি সেটি হলো– পাবনার কুতুব নামে একজনের সাথে আমরা একসাথে ট্রেনিং নিয়েছি। সে খুবই ভালো যোদ্ধা ছিল। আমরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরলাম। বাঁচলে দেখা হবে আর মরে গেলে হাশরের মাঠে দেখা হবে। আমি বাংলাদেশে ঢুকলাম; সেও ঢুকলো। সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে কুতুব যখন গঞ্জেরহাটে পৌছাল তখন সে শুনতে পেল তার বাবা এবং চাচার অত্যাচারে এলাকার মানুষ তটস্থ। বাবা ছিল শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, চাচা ছিল রাজাকার। কুতুবকে একটা অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া

হয়েছিল। সে অপারেশন না করে গঞ্জেরহাট থেকে বাজার করে সোজা বাড়িতে চলে গেল। সাথে নিল প্রায় ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা। ওদেরকে বাসায় ঢোকায়নি। বাড়ির চারদিক ঘেরাও করে রেখেছিল। কুতুব তার বাবা/চাচাকে ঘরের ভেতর থেকে বাইরে এনে অজু করিয়ে, নামাজ দোয়া পড়িয়ে, দেয়ালের পাশ দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করল। কতটা দেশপ্রেম থাকলে ১৬/১৭ বছর বয়সী একটা ছেলে তার বিপথগামী বাবা-চাচাকে মারতে পারে? মুক্তিযুদ্ধ সময়ে এটি ছিল এক বিরল ঘটনা।

এরপর আমি ৭ দিনের ছুটি নিয়ে আসলাম। আমি যখন রামগঞ্জে গাড়ি থেকে নামলাম তখন সেখানে আমাকে বাবা-মা কেউ চিনতে পারল না। আমাকে দেখে মা পালিয়ে যাচ্ছিল। বললাম, মা আমি তোমার ছেলে, পালাচ্ছ কেন? বাবাকে দেখি তার চুল পেকে গেছে আমার চিন্তা করে। কারা যেন বাবাকে খবর দিয়েছিল যে আমি গুলি খেয়ে মরে গেছি, কেউ বলেছে মারাত্মক জখম হয়েছি– বাঁচা মরার ঠিক নেই। বাবা আমাকে জীবিত দেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। এ এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। যা হোক তাদেরকে সান্ত্বনা দিলাম। আমার ছোট ভাই-বোনগুলো বলল, ভাই এক মাস ধরে মাংস মুখে দেইনি। ওরা অনেক কষ্ট করে চলেছে। আমার ছোট ভাইটা ডিম বিক্রি করে কোনোমতে সংসারটা চালাত। তারপর ইসলামপুর থেকে ভাই-বোনদের জন্য ঈদের বাজার করলাম। মুরগি-খাসির মাংস নিয়ে আসলাম। আমি বসে বসে ভাই-বোনদের খাওয়া দেখছি। কি তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে, কতদিন যাবৎ এত ভালো খাওয়া ওরা খায়নি। অথচ ট্রেনিংয়ে আমাদেরকে ভালোই খাবার দিত। প্রতি সপ্তাহে মাছ-মাংস দিত।

এরপর আমরা বাংলাদেশে ঢুকলাম। মুজিব বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার রশিদুল ইসলাম এর নেতৃত্বে আমরা দেড়শ জন ৬নং সেক্টরে ছিলাম।

প্রত্যয় : আপনি কতজন রাজাকারকে ধরলেন?

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু : আমি ১৪ জন রাজাকার ধরে আনলাম। আমার এই বাড়িটা লতাপাতার জঙ্গলে আচ্ছাদিত ছিল। এখানে একটা নিকৃষ্ট বিহারী কসাই ছিল। আমরা চলে যাওয়ার পরে বাড়িটা তারা দখলে নিয়েছিল। আমি চিন্তা করলাম যে ওরা যাওয়ার সময় যদি মাইন পুতে রাখে তা হলে তো আমার পা-টাই চলে যাবে সে কারণে রাজাকারদের দিয়ে পুরো বাড়িটা পরিস্কার করালাম। দুটো মোস্ট ক্রিমিনাল ছিল ওরা জীবনের ভয়ে রাজাকার হয়েছে, আর দুটা স্ব-ইচ্ছায় রাজাকার হয়েছে। এ দুজনকে আমি খরচের খাতায় তুলে দিলাম।

প্রত্যয় : ঠাকুরগাঁও মুক্ত হলো কবে? আপনারা এসে কি পাকবাহিনীর কাউকে পেলেন?

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু : ঠাকুরগাঁও মুক্ত হলো ৩ ডিসেম্বর। আমরা এসে পাকবাহিনীর কাউকেই পাইনি। ওরা ততোদিনে পালিয়ে গেছে। আরেকটি ঘটনা, ইন্ডিয়ান মেজর শার্কি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। আমি তো ঠাকুরগাঁওয়ের স্থানীয় ছেলে। মেজর শর্কি আমাকে ঠাকুরগাঁও পাঠাবেন– এখানে একটা টর্চার সেল আছে তা জানার জন্য। টাঙন নদীর ওপর একটা ব্রিজ ছিল। ঐ ব্রিজে কয়জন ডিউটি দেয় এগুলো ম্যাপ করে আনতে হবে। আমি তখন বললাম, স্যার দেখুন, আমি ছাত্রলীগ করা ছেলে। আমি গেলে ওরা আমাকে চিনে মেরে ফেলবে। আপনি যদি রংপুর বা দিনাজপুর যেতে বলেন, তা হলে যাবো। শুনে সে মুখ খারাপ করে বলে যে, আমাকেই যেতে হবে। তখন আমার এক বন্ধু বললো, তুমি ওর সাথে তর্ক করছ কেন? ও তো ইন্ডিয়ান, ওকি বাংলাদেশে ঢুকবে? চলো তোমাকে শহরে ঢুকাবো না। তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আমরা শহরে ঢুকবো। মেজরটা আমাকে তখন খুব বাজে ভাষায় বকা দিয়েছিল। খুবই খারাপ লাগলো– এক পর্যায়ে চিন্তা করলাম ওকে মেরে দেবো নাকি? তারপর বাংলাদেশে ঢুকবো।

এরপর আমরা এলাম। এখানে একটা গোরস্থান ছিল। পাঁচিল টপকে আমি গোরস্থানে ঢুকলাম আর বন্ধুরা কেউ চাল বিক্রেতা, খড়ি বিক্রেতা সেজে শহরে ঢুকলো। আমি গোরস্থানে থেকে গেলাম। রাতে দেখি হানাদাররা গোরস্থানের ওপর দিয়ে সার্চ লাইট ঘোরাচ্ছে আর সব দিনের আলোর মত ফর্সা হয়ে যাচ্ছে। তখন আমি একটা ভাঙা কবরের মধ্যে লাফ দিয়ে নামলাম। দেখি কবরটার মধ্যে একটা লাশ। মনে হয় ২/৩দিন আগে মেরে ফেলে রেখেছে। টিপে দেখলাম কতটা পচন ধরেছে। এরপর লাশটাকে উপুর করে দিয়ে আশপাশ থেকে কিছু লতাপাতা এনে লাশের পিঠের ওপরে রেখে বালিশ বানালাম। আপনারা এখন কল্পনাও করতে পারবেন না যে আমি লাশের সাথে আছি কিন্তু ভয় পাইনি। আমি ভূত, সাপ এসবের ভয় পাইনি। তবে ভয়ে ছিলাম পাঞ্জাবিরা যদি আসে। এভাবে সেখানে রাতটা পার করলাম। পরদিন বন্ধুরা ম্যাপ করে এসে হুইসেল দিলে আমি সেখান থেকে বাইরে আসি।

প্রত্যয় : বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর তিনি আপনাদের কি করার নির্দেশ দিলেন?

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু : আমাদের লিডার বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি দেশে এসে স্বাধীন-সার্বভৌম স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার উদ্যোগ নেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন যে, আমার নির্দেশে তোমরা হাতিয়ার তুলে নিয়েছিলে এখন আমার নির্দেশে তোমরা হাতিয়ার জমা দাও। দেশ গড়ার কাজে যুক্ত হও। আমার যে বস ছিলেন সিরাজুল আলম খান, তার সাথে আমি ৩ মাস ঘুরেছি। মুক্তিবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন বাশার সাহেব আর মুজিব বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান। সিরাজুল আলম খান ভাই ব্রিফ করেছিল যে অস্ত্র জমা দিবা না। ওনারা ধারণা করেছিল যে বঙ্গবন্ধুকে তো বাঁচিয়ে রাখবে না, তখন তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল, ক্যাপ্টেন কামরুল, মনসুর আলীকে ডিঙিয়ে ক্ষমতা নেয়া সম্ভব না। কাউন্টার রেভ্যুলেশন করে, রিভল্ট করে ক্ষমতা নেয়া হবে। সে জন্য হাতিয়ার জমা দিতে নিষেধ করেছেন।

প্রত্যয় : তখন কি আপনারা অস্ত্র জমা দিলেন, না দেননি?

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু : বঙ্গবন্ধুই ছিলেন আমাদের প্রধান নেতা। তিনি যখন বললেন, তখন এখান থেকে আমরা প্রায় ৫০ জন ঢাকায় গিয়ে স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধুর নিকট অস্ত্র জমা দেই। আমি ভাবলাম আমার স্টেনগানটা যখন বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেব তখন তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করবো। কিন্তু তিনি তা করতে দেননি। আমার বাহুটা চেপে ধরলেন– এই তুই কি করছিস? আমি বললাম, সালাম করি– তিনি বললেন না। তুই তো মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদের স্থান পায়ে নয়, আমার বুকে। বলেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। সেদিনের আজাদ পত্রিকায় সেই ছবি ছাপা হয়েছিল।

প্রত্যয় : স্বাধীনতার পর যখন জাসদ গঠিত হলো তখন কি আপনি জাসদের রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন?

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু : না। সবাই জানতো যে আমি জাসদে যাবোই। কারণ, সিরাজুল আলম খানের সাথে আমার যে সম্পর্ক ছিল সে কারণেই এমন ধারণা ছিল। সিরাজুল আলম খানের মতো এমন তাত্ত্বিক নেতা আর মনি ভাইয়ের মতো এতো তীক্ষ্ন নেতা যুগে যুগে জন্ম নেবে না। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে ঘিরেই আমাদের রাজনীতি, আমাদের স্বপ্ন। যখন স্টেডিয়ামে হাতিয়ার জমা দিতে গেলাম, মনে মনে চিন্তা করলাম– মুক্তিযুদ্ধ তো করলাম, বঙ্গবন্ধুর মতো এত বড় নেতা তো বিশ্বে আর জন্ম নেবে না। এ দেশে তাঁকে আমরা কিন্তু সঠিকভাবে চিনতে পারিনি।

প্রত্যয় : এখন তো প্রচুর ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার খবর পাওয়া যায়। আপনারা যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধো তাদের বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য?

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বাবলু : আমি এসব ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ঘৃণা করি এবং এর প্রতিবাদ জানাই। আমি গণভবনে গিয়ে নেত্রীকে এটা জানিয়েছি। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের আলাদা কবরস্থান করার জন্য বলেছি। কারণ, একজন মুক্তিযোদ্ধার কবর একজন রাজাকারের পাশে হতে পারে না। এখন দেশের সর্বত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানের সাথে আলাদা স্থানে কবর দেয়া হয়।■

পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের সমকালীন সৃজনশিল্প | একটি রেখাংকন

জাহিদ মুস্তাফা

বাংলাদেশ রাষ্ট্র অভ্যুদয়ের পঞ্চাশ বছরে নানাক্ষেত্রে আমরা এগিয়েছি। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনের কতকক্ষেত্রে পশ্চাৎপসরণের মতো ঘটনাও ঘটেছে! তবে আশার কথা- এসব দুর্যোগ পেছনে ফেলে অগ্রগামিতার বিচারে আমাদের উল্লেখযোগ্য অর্জনের অন্যতম শ্লাঘার জায়গা হয়েছে বাংলাদেশের মঞ্চনাটক ও এর সমান্তরালে এগিয়ে যাওয়া সমকালীন চারুশিল্প ।

আমাদের সৃজনশিল্প এশীয় পরিসর ছাড়িয়ে আজ বিশ্ব পরিসরে তার আপন মহিমায় নিজের মর্যাদাকে উর্ধ্বে তুলে ধরছে! দুনিয়ার দামি দামি চারুকলা প্রদর্শনী, আর্ট প্রজেক্ট, এক্সপজিশনে আমাদের তরুণ ও প্রজ্ঞাবান শিল্পীরা স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে এখন অব্দি নিয়মিত অংশ নিচ্ছেন এবং নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার পরিচয় বহন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে চলেছেন।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর অনুকূল পরিস্থিতিতে নানাক্ষেত্রের ন্যায় শিল্পীদের হাত ধরে চারুশিল্প নতুন পথের দিশার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। পাকিস্তানি আমলে ধর্মীয় সীমাবদ্ধতায় ভাস্কর্য নির্মাণের প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থা সাময়িকভাবে কেটে যায় এবং মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির অসম সাহসিকতায় পরাধীনতার শৃঙ্খল ঘুচে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বহিরাঙ্গন ভাস্কর্য নির্মাণযজ্ঞ শুরু হয়।

জাগ্রত চৌরঙ্গী

অপরাজেয় বাংলা

জাগ্রত চৌরঙ্গী

১৯৭৩ সালে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুর চৌরাস্তায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম ভাস্কর্য-জাগ্রত চৌরঙ্গী প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকা ও যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পে পাঠ নেয়া শিল্পী ও ভাস্কর অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক এটির নির্মাতা। এক মুক্তিযোদ্ধার ঊর্ধ্বমুখী বাস্তবানুগ অবয়বের সঙ্গে তার শরীর সংস্থানে সিলিন্ডার ধারার প্রয়োগ এটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

১৯৭১ সালের ১৯ মার্চের আন্দোলন ছিল মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। আর এই প্রতিরোধ যুদ্ধে শহীদ হুরমত উল্যাসহ শহীদদের অবদান এবং আত্মত্যাগকে জাতির চেতনায় সমুন্নত রাখতে জয়দেবপুর চৌরাস্তার সড়কদ্বীপে স্থাপন করা হয় দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য-জাগ্রত চৌরঙ্গী।

অপরাজেয় বাংলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকা তিন নারী-পুরুষের ভাস্কর্য 'অপরাজেয় বাংলা' স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণকে তুলে ধরেছে। দুই যুবক ও এক নারী অবয়বের এই ভাস্কর্য। ১৯৭৯ সালের ১৯ জানুয়ারি এর নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং ১৯৭৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর সকালে এর উদ্বোধন করা হয়। স্বাধীনতার এই প্রতীক গড়ে তুলেছেন গুণীশিল্পী ও ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ।

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির পশ্চিম পাশে ডাসের পেছনে অবস্থিত এ ভাস্কর্যে প্রতিফলিত হয়েছে পাকিস্তানি হানাদারের অত্যাচারের খণ্ড-চিত্র। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং এটির কাজ শেষে ১৯৮৮ সালের ২৫ মার্চ উদ্বোধন করা হয়। এটি গড়েছেন ভাস্কর শামীম সিকদার।

সংশপ্তক

সাভারের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে ১৯৯০ সালের ২৬ মার্চ নির্মিত হয় স্মারক ভাস্কর্য সংশপ্তক। এ ভাস্কর্যটির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে- যুদ্ধে শত্রুর আঘাতে এক হাত, এক পা হারিয়েও রাইফেল হাতে লড়ে যাচ্ছেন দেশমাতৃকার বীর সন্তান। এর ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান।

শাবাশ বাংলাদেশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকে খানিক অগ্রসর হলে সিনেট ভবনের দক্ষিণে 'শাবাশ বাংলাদেশ' নামের ভাস্কর্য। ১৯৯১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে শিল্পী নিতুন কুণ্ডুর নকশায় নির্মাণকাজ শুরু হয়। নির্মাণ শেষে এর ফলক উন্মোচন করেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম।

দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি হয়ে ভাস্কর্যটি দাঁড়িয়ে আছে ৪০ বর্গফুট জায়গা নিয়ে। একজন রাইফেল উঁচু করে দাঁড়িয়ে, অন্যজন রাইফেল হাতে দৌড়ের ভঙ্গিমায়। এ দুজন মুক্তিযোদ্ধার পেছনে ৩৬ ফুট উঁচু দেয়াল। এর ওপরের দিকে রয়েছে সূর্যের মতো শূন্য বৃত্ত। ভাস্কর্যটির নিচের দিকে ডান ও বাম উভয়পাশে ৬ ফুট বাই ৫ ফুট উঁচু দুটি ভিন্ন চিত্র। ডানদিকের দেয়ালে রয়েছে দুজন যুবক-যুবতী। শশ্রুমুন্ডিত যুবকের কাঁধে রাইফেল, কোমরে গামছা বাঁধা, যেন বাউল। আর যুবতীর হাতে একতারা। বাম দিকের দেয়ালে রয়েছে মায়ের কোলে শিশু, দুজন যুবতী একজনের হাতে পতাকা। পতাকার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গেঞ্জিপরা এক কিশোর।

বিজয় '৭১

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিসংগ্রামে বাংলার সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মূর্ত প্রতীক হয়ে আছে- ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনের সামনে 'বিজয় '৭১'। একজন কৃষক মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশের পতাকা তুলে ধরেছেন আকাশের দিকে। তার ডান পাশেই শাশ্বত বাংলার সর্বস্বত্যাগী ও সংগ্রামী নারী দৃঢ়চিত্তে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন। যার সঙ্গে আছে রাইফেল। অন্যদিকে একজন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা গ্রেনেড ছোড়ার ভঙ্গিমায় বাম হাতে রাইফেল নিয়ে তেজোদীপ্তচিত্তে দাঁড়িয়ে। ভাস্কর শ্যামল চৌধুরীর নকশা ও তত্ত্বাবধানে বিজয় '৭১ ভাস্কর্যটির নির্মাণকাজ ২০০০ সালের জুন মাসে শেষ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সামনের সড়কদ্বীপে স্থাপিত রাজু স্মৃতি ভাস্কর্য তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও অগণিত বাঙালি-অবাঙালির স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত একটি অসাধারণ স্মারক স্থাপনা। বাঙালির বীরোচিত সংগ্রাম, যুদ্ধ ও আত্মদানের অবিচল আকাঙ্ক্ষার দৃঢ় প্রতীক এই স্থাপনার নান্দনিক নকশা প্রণয়ন করেছেন স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন।

সর্বজনীন এই স্মৃতিস্তম্ভে মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের দশটি গণকবর রয়েছে। ১৫০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট শীর্ষ বাহুটির দুপাশে ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে আসা তিনটি করে ছয়টি অর্থাৎ মোট সাতটি বাহু সাতজন বীরশ্রেষ্ঠর প্রতীক। ১৯৭৮ সালে এর

নির্মাণকাজ শুরু হয়ে ১৯৮২ সালে শেষ হয়।
বিদেশি রাষ্ট্রনায়কগণ সরকারিভাবে বাংলাদেশ সফরে আগমন করলে এই স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন রাষ্ট্রাচারের অন্তর্ভুক্ত।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অবস্থিত। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার যে স্থানে শপথ গ্রহণ করে ঠিক সেই স্থানে এটি নির্মিত হয়েছে।
১৯৭৪ সালে মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণের তৃতীয় বর্ষপূর্তিতে বঙ্গবন্ধু এখানে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের মূল কাজ শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। এর স্থপতি তানভীর কবির। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ স্বাধীনতার স্মৃতি ধরে রাখতে এই স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলেন। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা মুজিবনগর কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজ শুরু করেন।
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের ভেতরে শপথ গ্রহণস্থানে ২৪ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট প্রশস্ত সিরামিকের ইট দিয়ে একটি আয়তকার লাল মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। মাঝখানে স্মৃতিসৌধটি ২৩টি ত্রিভুজাকৃতি দেয়ালের সমন্বয়ে বৃত্তাকার উপায়ে সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে। ২৩টি দেয়াল (আগস্ট ১৯৪৭ থেকে মার্চ ১৯৭১)- এই ২৩ বছরের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
প্রথম দেয়ালটির উচ্চতা ৯ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য ২০ ফুট। পরবর্তী প্রতিটি দেয়ালকে ক্রমান্বয়ে দৈর্ঘ্য ১ ফুট ও উচ্চতা ৯ ইঞ্চি করে বাড়ানো হয়েছে। যা দ্বারা বোঝানো হয়েছে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার জন্য ৯ মাস ধরে যুদ্ধ করেছিল। শেষ দেয়ালের উচ্চতা ২৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ও দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট। প্রতিটি দেয়ালের ফাঁকে অসংখ্য ছিদ্র আছে যেগুলোকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের চিহ্ন হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে। স্মৃতিসৌধটির ভূমি থেকে ২ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু বেদীতে অসংখ্য গোলাকার বৃত্ত রয়েছে যা শহিদ বুদ্ধিজীবীদের করোটির প্রতীক।
স্মৃতিসৌধের ভূমি থেকে ৩ ফুট উচ্চতার বেদীতে অসংখ্য পাথর ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের প্রতীক। পাথরগুলোর মাঝখানে ১৯টি রেখায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৯টি জেলাকে নির্দেশ করা হয়েছে। স্মৃতিসৌধের বেদীতে ওঠার জন্য ১১টি সিঁড়ি মুক্তিযুদ্ধকালীন ১১টি সেক্টরের প্রতীক।
এসব স্থাপনা ও ভাস্কর্য ছাড়াও গত পঞ্চাশ বছরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, সিলেট, যশোর, খুলনাসহ দেশের নানা জেলা শহরে বরেণ্য ব্যক্তির অবয়ব ও মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক অসংখ্য ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে ভাস্কর সুলতানুল ইসলামের গড়া ভাস্কর্য- 'দূরন্ত' শৈশবের স্মৃতিকে তুলে ধরে।
বহিরাঙ্গন ও স্টুডিও ভাস্কর্যে এসময় সৃষ্টিশীলতা দেখিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন ভাস্কর আনোয়ার জাহান (প্রয়াত), মজিবুর রহমান, জুলফিকার লেবু, রাসা, এনামুল হক, মৃণাল হক (প্রয়াত), তৌফিক রহমান, বদরুল আলম নান্নু, মাহাবুব জামাল, লালা রুখ সেলিম, রেজাউজ্জামান, সেলিম আহমেদ (প্রয়াত), হাবিবুর রহমান, মোস্তফা শরিফ আনোয়ার, মিতু হক, ময়নুল ইসলাম পল, কাজী সাইফুদ্দিন আব্বাস, মাহবুবুর রহমান, শহিদুজ্জামান শিল্পী, গোপাল চন্দ্র পাল, মুকুল বাড়ৈ, মুক্তি ভৌমিক, নাসিমুল খবির ডিউক, হাবিবা আকতার পাপিয়া, তেজস হালদার যশ প্রমুখ শিল্পী ও ভাস্কর।
পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের চিত্রকলার প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অনেক বিস্তৃত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের চারুশিল্পীদের সৃজন ধ্যানের প্রতিফলন ঘটছে নিয়মিত। ভারত-জাপান-চীন-কোরিয়া-স্পেন-গ্রীস-ফ্রান্স- ইতালিতে পড়তে যাওয়া বাংলাদেশের শিল্পীদের হাত ধরে এদেশের চারুশিল্পাঙ্গনের সৃজনধারায় অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। এ ছাড়াও ঢাকায় ১৯৮১ সাল থেকে আজ অব্দি আয়োজিত এশীয় দ্বিবার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী থেকে শুরু করে, দিল্লি ত্রিবার্ষিক, বেইজিংয়ের আন্তর্জাতিক চারুকলা প্রদর্শনী, ইতালির ভেনিস বিয়েনাল, জাপান-কোরিয়া, তুরস্ক-চেক-জার্মান এসব দেশে আয়োজিত অসংখ্য প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের শিল্পীদের সৃজনকর্ম প্রদর্শিত, প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হচ্ছে। বিদেশি শিল্পী ও সমঝদারদের সঙ্গে বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগ বাড়ছে।
আমাদের সৌভাগ্য এই যে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের চারুশিল্পাঙ্গনে আমাদের গুরুপ্রজন্মের শিল্পীরা সক্রিয় ছিলেন! মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত মুক্ত পরিবেশের প্রভাব তাদের চিত্রকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। জয়নুল আবেদিন যেমন 'স্বাধীনতা' শিরোনামে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় মিছিল এঁকেছেন, আবার অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনকে নতুন করে রূপায়িত করেছেন। কামরুল হাসান তার চিত্রকলায় স্বাধীনতার আনন্দকে ধারণ করেছেন, আবার স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অসাধু লোক ও স্বাধীনতাবিরোধীদের চক্রান্তে সৃষ্ট সংকটকেও তার চিত্রে তুলে ধরেছেন বিষধর সাপ ও শৃগালের প্রতীকে। এস এম সুলতান কৃষক জীবনের সংগ্রামকে ফসল ফলানোর সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিল্পের লোকজ ফর্মকে আধুনিক বিন্যাসে নন্দিতরূপে মেলে ধরেছেন- রশীদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, সমরজিৎ রায় চৌধুরী প্রমুখ শিল্পী। ট্যাপেস্ট্রি বুননে বাংলার শিল্পফর্ম ও বর্ণিলতাকে আশ্রয় করেছিলেন রশীদ চৌধুরী।
লোকশিল্পাশ্রিত চিত্রকলার পাশাপাশি কাইয়ুম বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের

বিজয় '৭১

রাজু ভাস্কর্য

খোলনলচে পালটে দিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের প্রচ্ছদশিল্পে যেসব চারুশিল্পীরা প্রকাশনাকে ঋদ্ধ করেছেন বা করছেন তারা হলেন- প্রয়াত কাজী হাসান হাবীব, আবদূর রৌফ সরকার, সমর মজুমদার, আনওয়ার ফারুক, অশোক কর্মকার, হিরন্ময় চন্দ, ধ্রুব এষ, উত্তম সেন, মাসুক হেলাল, মোস্তাফিজ কারিগর, রাজীব রায়, গৌতম ঘোষ প্রমুখ।

বিগত তিন দশকে সাহিত্যের লোকজ চরিত্র নিয়ে দৃষ্টিনন্দন ছবি এঁকে সুনাম অর্জন করেছেন আবদুস শাকুর শাহ্।

গত শতকের ষাটের দশকে সূচিত শিল্পের আধুনিকতার চর্চায় নিয়োজিত শিল্পী আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, মূর্তজা বশীর, দেবদাস চক্রবর্তী, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, কাজী আবদুল বাসেত প্রমুখের উচ্চতর বিকাশ ঘটেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর। এদেশে প্রকাশবাদী বিমূর্ত শিল্পের মান অন্যরকম উচ্চতায় নিয়ে গেছেন মোহাম্মদ কিবরিয়া। তাদের হাত ধরে পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পী আবু তাহের, মাহমুদুল হক, কালিদাস কর্মকার, হাসি চক্রবর্তী, মো. গিয়াসউদ্দিন, রেজাউল করিম, মো. ইউনুস, তাজুদ্দিন, গোলাম ফারুক বেবুলসহ সমকালীন তরুণ শিল্পীরা।

দর্শকপ্রিয়তাকে মাথায় রেখে গত শতকের সত্তর থেকে আশির দশকে এদেশে বাস্তবানুগ ও অর্ধ্ব বিমূর্ত শিল্পের জোয়ার আসে। জয়নুল-সফিউদ্দিনের শিল্পাদর্শে উজ্জীবিত একদল শিল্পী ষাটের দশকেই প্রকৃতি ও জনজীবনের ছবি আঁকতে শুরু করেন। এই শিল্পীরা হলেন- হাশেম খান, রফিকুন নবী, মনিরুল ইসলাম, আবুল বারক আলভী, শহিদ কবির, শাহাবুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর শিল্পের এই ধারা আরও বিস্তৃত ও বেগবান হয়। আবদুল মান্নান, বীরেন সোম, মনসুর উল করিম, খাজা কাইয়ুম, অলকেশ ঘোষ, আবদুস সাত্তার, চন্দ্রশেখর দে, নাসিম আহমেদ নাদভী, ফরিদা জামান, রণজিৎ দাস, নাজলি লায়লা মনসুর, রতন মজুমদার, সৈয়দ ইকবাল, দীপা হক, কাজী রকিব, জামাল আহমেদ, নাসরীন বেগম, মুস্তফিজুল হক, তরুণ ঘোষ, রোকেয়া সুলতানা, দিলারা বেগম জলি, মানিক দে, আহমেদ সামসুদ্দোহা, শেখ আফজাল প্রমুখ শিল্পীরা এই ধারাটিকে এগিয়ে নেন।

দেশের বাইরে ইউরোপ-আমেরিকা মহাদেশের বেশ কয়েকটি দেশে- বাংলাদেশের চারুশিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী কয়েকজন শিল্পী বসতি গড়েছেন, তাদের মাধ্যমেও আমাদের শিল্পের হাল হকিকতের সঙ্গে সেসব দেশের শিল্পী ও সমঝদারদের জানাশোনা হচ্ছে। এ দলে আছেন কিংবা ছিলেন-শহিদ মিনারের স্থপতি ফ্রান্সে প্রয়াত ভাস্কর নভেরা আহমেদ, স্পেনের সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাবপ্রাপ্ত শিল্পী মনিরুল ইসলাম, শিল্পী শহিদ কবীর, টোকিওতে শিল্পী গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, ফরাসি সরকারের সর্বোচ্চ সম্মানপ্রাপ্ত বাংলাদেশের অন্যতম বীর মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, জার্মানির কোলনে মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী মারুফ আহমেদ, ডেনমার্কে শিল্পী রুহুল আমিন কাজল, ইতালিতে শিল্পী উত্তম কুমার কর্মকার ও শফিকুল কবির চন্দন, টরেন্টোতে শিল্পী তাজুদ্দিন, সৈয়দ ইকবাল, ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ ও লায়লা শর্মিন, যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পী কাজী রকিব।

সত্তর ও আশির দশকে চিত্র প্রদর্শনী ও অন্যান্য ইস্যুতে বেশ কয়েকটি শিল্পীগ্রুপ গড়ে ওঠে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ঢাকা পেইন্টার্স, সময়, ঈষিকা প্রভৃতি। সময় গ্রুপ প্রতিষ্ঠাতা শিল্পীরা হলেন- ঢালী আল মামুন, নিসার হোসেন, শিশির ভট্টাচার্য, ওয়াকিলুর রহমান, পশ্চিমবঙ্গপ্রবাসী হাবিবুর রহমান ও তৌফিকুর রহমান। এঁদের শিল্পকর্মে রাজনীতি সচেতনতা ও সমাজ বাস্তবতা উঠে এসেছে। এই ধারার কাছাকাছি ও নারীর সামাজিক অবস্থান আর কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে ছবি আঁকেন রোকেয়া সুলতানা লাভলি, নাইমা হক, আতিয়া ইসলাম, তৈয়বা বেগম লিপি। কনকচাঁপা চাকমা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আচার, সৌন্দর্য আর পাহাড়ি দৃশ্যপট নিয়ে দৃষ্টিনন্দন ছবি আঁকেন।

আন্তর্জাতিকতা, দৃশ্যশিল্প, মুক্তিযুদ্ধ, দেশের প্রকৃতি ও মানুষের নানা বিষয় নিয়ে ছবি আঁকেন এমন কয়েকজন সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে আছেন- মনিরুজ্জামান, ইফতেখারউদ্দিন আহমেদ, উত্তম দত্ত, মোখলেসুর রহমান, অশোক কর্মকার, সৈয়দা মাহবুবা করিম, নাসিমা খানম কুইনি, কংকা জামিল, শামিম সুব্রানা, গুলশান, হোসেন, রফী হক, মাকসুদুল আহসান, ড. মোহাম্মদ ইকবাল আলী, সুফিয়া বেগম, ফারুক আহমেদ মোল্লা, আলপ্তগীন তুষার, শাহজাহান আহমেদ বিকাশ, ড. রশীদ আমিন, জাহেদ আলী চৌধুরী, সনজীব দাস অপু, শামছুল আলম আজাদ, কিরিটি বিশ্বাস, রেজাউল হক, সালাউদ্দিন আহমেদ, মাকসুদা ইকবাল, দুলাল গাইন, আনিসুজ্জামান, ফিরোজ মাহমুদ, ড. সুশান্ত অধিকারী, ড. হীরা সোবাহান, অনুকূল চন্দ্র মজুমদার, রবিউল ইসলাম, গুপু ত্রিবেদী, নাজিয়া আন্দালিব প্রিমা, বিপাশা হায়াত, ড. মলয় বালা, শহিদ কাজী, কামাল উদ্দিন, সুমন ওয়াহিদ, মেহেদি হাসান, রত্নেশ্বর সূত্রধর, তাসলিমা আকতার বাঁধন, আজমীর হোসেন, বিশ্বজিৎ সোম, মনজুর হোসেন, শাহনুর মামুন, সোহাগ পারভেজ প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক শিল্পের ন্যায় বিগত চার দশক ধরে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের চারুশিল্পে নিউমিডিয়ার আবির্ভাব ঘটেছে। ইনস্টলেশন বা স্থাপনা, ভিডিও আর্ট ও পারফরম্যান্স আর্টের প্রসার ঘটে। গত শতকের নব্বই দশকের গোড়ায় মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালায় শিল্পী অশোক কর্মকার কৃত কালরাত্রি অডিও-ভিজ্যুয়াল স্থাপনা হিসেবে সে সময় সুধীজনের বিশেষ প্রশংসা পায়। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানিদের দ্বারা বাঙালি মা-বোনদের প্রতি সংঘটিত ধর্ষণ-নির্যাতন নিয়ে শিল্পী ঢালী আল মামুন অসংখ্য হাতের বিন্যাসে অনন্য এক স্থাপনা উপস্থাপন করেছেন। ২০১৩ সালে এটি ৫৫ তম ভেনিস বিয়েনালে প্রদর্শিত হয়।

বিগত তিনবার এখানে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের শিল্পীরা হলেন- মাহবুবুর

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

রহমান, তৈয়বা বেগম লিপি, ইমরান হোসেন পিপলু, মাসুম চিশতি, মোখলেসুর রহমান, লালা রুখ সেলিম, অশোক কর্মকার, মাহবুব জামাল, উত্তম কুমার কর্মকার, ইয়াসমিন জাহান নূপুর ও বিশ্বজিৎ গোস্বামী প্রমুখসহ এই লেখক নিজে। ইয়াসমিনের পারফর্ম্যান্স আর্ট ঢাকা ও ভেনিসে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত- বাংলাদেশে নিউমিডিয়া আর্ট প্রসারে বৃত্ত আর্ট ট্রাস্ট ও সন্তরণের ভূমিকা অসামান্য!

পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্প শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এর ফলে তরুণ শিল্পীদের পাশাপাশি নারীশিল্পীদের বিপুল উত্থান ঘটেছে বিগত দুই তিন দশক জুড়ে। প্রকৃত শিল্প সমঝদারদের দেখাদেখি নব্যধনীকদের ছদ্ম শিল্পপ্রীতির কারণে শিল্পকর্মের বাজারও রমরমা হয়েছে। সমকালীন চারুশিল্পের অগ্রগতিতে এই বাজার প্রসারে চিত্রশালা ও আর্টশপের ভূমিকাও একেবারে কম নয়। তবে নানা সংকটকালে শিল্পের বাজার ক্ষতির মুখে পড়ে, এর উদাহারণ হতে পারে বর্তমানের অতিমারীতে শিল্পের সংগ্রহের ব্যাপক হ্রাস! এই সংকটকে সাময়িক ধরলেও এটি প্রধানত ফ্রিল্যান্সার শিল্পীদের অর্থনৈতিক ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। আমরা আশাবাদী- সাময়িক সব সংকট কাটিয়ে আমাদের চারুশিল্প আরও সৃজনশীল ও মানবকল্যাণহিতৈষী হয়ে স্বদেশকে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখাবে।■

বুরো বাংলাদেশ এর মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের যাত্রা

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের একটি শিক্ষা

লেখক : আনন্ত তিওয়ারী, বিজয় ভৌমিক, রবি কান্ত, শান্তম মন্ডল, আনিশ গুলাটি
অনুবাদ : ডিএফএস টিম, কর্মসূচী বিভাগ-বুরো বাংলাদেশ

বুরো বাংলাদেশ এ মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর প্রেক্ষাপট

ছোট দোকানের মালিক রুকসানা বেগম বিগত সাত বছর ধরে বুরোর সদস্য। সাপ্তাহিক কেন্দ্র সভায় তিনি তার ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় নগদ অর্থে প্রদান করতেন। এই কেন্দ্র বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে রুকসানাকে তার দোকান বন্ধ করে আসতে হতো। যখন বুরো মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS) ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের বিকল্প ব্যবস্থা চালু করে, তখন তিনি অবিলম্বে এই সুযোগ গ্রহণ করেন। রুকসানার বিশ্বাস, এমএফএস ব্যবহার তাকে সময় বাঁচানোর পাশাপাশি মহামারি থেকেও রক্ষা করেছিলো। এমএফএস এর মাধ্যমে, তিনি তার ঋণের বকেয়া পরিশোধ এবং কাতারে কর্মরত স্বামীর পাঠানো রেমিট্যান্স গ্রহণে স্ব-শরীরে না গিয়েও যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছে।

প্রায় ছয় বছর আগে, বুরো তার সদস্যদেরকে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS) প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা নিম্ন-মধ্যম আয়ের মহিলাদের জন্য। এমএফএস এর বিষয়টি ছিল বুরোর দ্বিমুখী কৌশল যা কর্মীদের ক্রমবর্ধমান নগদ লেনদেন সম্পর্কিত জালিয়াতি মোকাবেলা করার পাশাপাশি গ্রাহকদের ঋণ পরিশোধ ও সঞ্চয় প্রদানে একটি বাড়তি সুবিধা প্রদান।

এই কেস স্টাডি বুরোর এমএফএস যাত্রা এবং এনজিও ও তার গ্রাহকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাগুলি তুলে ধরে। মেটলাইফ ফাউন্ডেশন দ্বারা পরিচালিত ডিজিটাল মাইক্রোফাইন্যান্স প্রকল্পের অধীনে ডিজিটাল যাত্রা শুরু করতে MSC বুরো বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে।

বুরো'র এমএফএস যাত্রা

বুরো ২০১৫ সালে একটি এমএফএস প্রদানকারীর সহযোগিতায় মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর যাত্রা শুরু করে। বুরো সদস্যদের সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধার কথা মাথায় রেখে এমএফএস এর মাধ্যমে লেনদেনের কার্যক্রম শুরু করে। এজন্যে বুরো এবং MSC সম্ভাব্য এমএফএস ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন, মনোভাব, পছন্দ ও আচরণ বুঝার চেষ্টা করে। তারপর সকল স্তরের বিশেষজ্ঞ পরামর্শক, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং মাঠ কর্মীদের সাথে আলোচনা করে বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

তবে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম থেকে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি। এগুলো সমাধানের জন্য বুরো ২০১৭ সালে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়। পরবর্তীতে, বুরো ২০১৯ সালে একটি নতুন এমএফএস প্রোভাইডার প্রতিষ্ঠান বিকাশ লিমিটেড এর সাথে পুনরায় পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করে। নিচে এমএফএস চালু করার জন্য বুরো'র যে যাত্রা তার একটি সারাংশ তুলে ধরা হল।

মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) দ্বারা বুরো এবং এর সদস্যগণ কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন?

সদস্যগণের জন্য যেকোনো সময় যেকোন স্থান হতে অর্থ প্রদানের সুবিধা:

MSC তার সাক্ষাৎকারগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে যে, বুরোর সদস্যগণই MFS এর মাধ্যমে অর্থ প্রদানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। সদস্যগণ তাদের দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যক্রমে কোনো রকম বাধা ছাড়াই যেকোনো সময় যেকোনো স্থান হতে লেনদেন করতে পারেন। বিশেষ করে মহিলা সদস্যগণ MFS পদ্ধতিকে সুবিধাজনক বলে মনে করেন। তারা বাইরে না গিয়ে, পারিবারিক কাজগুলো নিরবিচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন করার পাশাপাশি তাদের লেনদেনগুলো চালিয়ে যেতে পারছেন। পাশাপাশি, যে সকল পরিবারগুলো বিদেশ থেকে রেমিটেন্স সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন, তারা MFS লেনদেন পেয়ে খুশি, কারণ এটি নগদ অর্থের প্রয়োজনীয়তা কমিয়েছে। গ্রাহকদের জন্য ১% সেবামূল্য থাকা সত্ত্বেও এই সুবিধাগুলোর জন্য

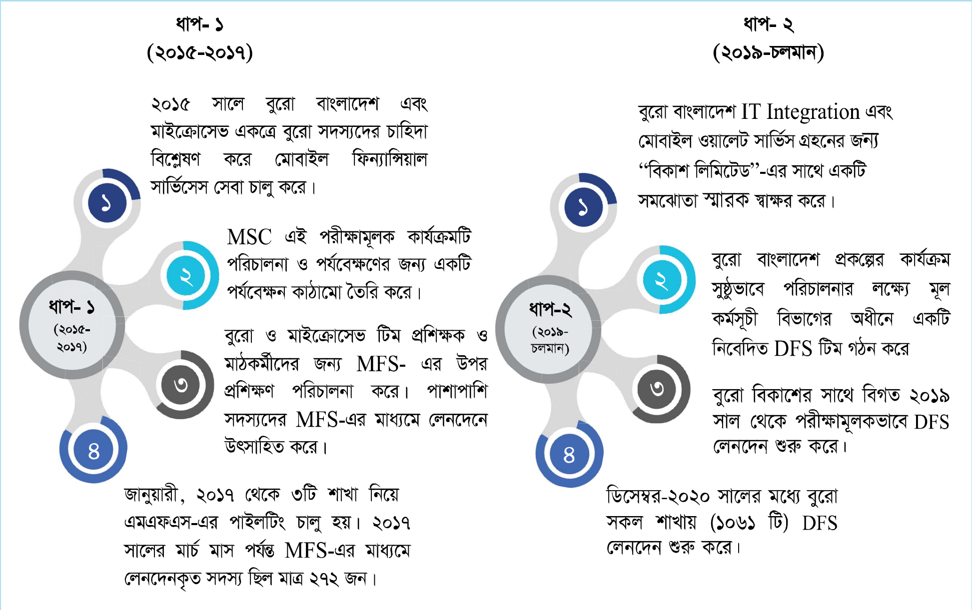

বুরোর সদস্যগণ MFS এর স্বেচ্ছাসেবী গ্রাহক এ পরিণত হয়েছে।

মাঠ কর্মীদের সময় ও খরচ কমিয়ে অপরেশনাল কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করেছে:
MFS বুরোর মাঠকর্মীদের প্রতিটি গ্রুপ মিটিং এর ২৫% সময় কমাতে সাহায্য করেছে। যার ফলে তারা তাদের অন্যান্য দায়িত্বের দিকে মনোনিবেশ করতে পারেন, শাখার ব্যবসায়িক সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার দিয়ে খেলাপি আদায়ের মাধ্যমে শাখার কার্যক্রমকে লাভজনক এবং উন্নত করতে পারেন। অধিকতর MFS লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় অ্যাকাউন্ট পোস্টিং এর সুবিধার জন্য শাখার সামগ্রিক হিসাব রাখার ক্ষেত্রে ১১% সময় এখন কম লাগে। MFS সেবার আওতায় যত বেশি সদস্য অন্তর্ভুক্ত হবে, বুরোর কার্যক্ষমতা ততোবেশি উন্নত হবে।

নগদ লেনদেনের ঝুঁকি কমাতে এবং কর্মী পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে:
যেহেতু, MFS এর কারণে মাঠ কর্মীকে সদস্যদের সাথে কোনো প্রকার নগদ লেনদেন করতে হয় না, সেহেতু MFS নগদ অর্থভিত্তিক লেনদেন কমাতে বুরোকে সাহায্য করেছে। জুন ২০২১ পর্যন্ত বুরোর সদস্যদের লেনদেনের ৭.৩% MFS চ্যানেলের মাধ্যমে হয়। MFS মাঠ কর্মীদের দ্বারা নগদ টাকা সম্পর্কিত অপব্যবহার তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে, একই সময় শাখা ব্যবস্থাপকের ডিজিটাল কাজের তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে প্রায় রিয়েল টাইম-এ, যা মাঠ কর্মীদের পর্যবেক্ষণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। বুরো বাংলাদেশ অর্থ কেলেঙ্কারী সংক্রান্ত কারণে কর্মীদের চাকরিচ্যুত হওয়ার ঘটনা MFS প্রক্রিয়া চালু হওয়ার আগের তুলনায় এখন ১৫ শতাংশ কমে গেছে।

সংকটের সময় দৃঢ় থাকা:
বাংলাদেশ ২০২০ সালে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান এবং কোভিড-১৯-এর দ্বিমুখী সংকটের সাথে মোকাবিলা করেছিল। MFS প্রক্রিয়ার কারণেই বুরো একটি সুবিধাজনক অবস্থান অর্জন করেছে, এটি এখন শারীরিক উপস্থিতির উপর নির্ভর না করে ডিজিটালভাবে গ্রাহকদের কাছ থেকে ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করতে পারে। মহামারি চলাকালীন MFS এর মাধ্যমে বুরোর মোট মাসিক আদায় পরিমাণের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২১ সালের জুন মাসে ৫.৭% এ পৌঁছেছে।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে বুরোর ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে:
সদস্য এবং মাঠ কর্মীদের MFS সুবিধাগুলোর মাধ্যমে বুরোর ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। MFS চালু করার পর সংস্থা ছেড়ে যাওয়া মাঠ কর্মীদের সংখ্যা ২২% কমে গেছে।

পাইলটিং-এর সময় যে চ্যালেঞ্জগুলোর সম্মুখীন হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে এবং লক্ষ্য অর্জনে বুরো বাংলাদেশ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?

বুরো বাংলাদেশ তার MFS Piloting এর প্রাথমিক পর্যায়ে (২০১৫-২০১৭) অনেকগুলো অপারেশনাল এবং প্রযুক্তিগত বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। Piloting এর প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাটি বুরো বাংলাদেশকে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য আরো ভালোভাবে প্রস্তুত করতে সহযোগিতা করে।

কর্মী নিয়োগ Piloting এর প্রথম পর্যায়ের জন্য বুরো বাংলাদেশ মাঠপর্যায়ে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করেছিল, কিন্তু তাদের কর্মক্ষমতা এবং প্রচেষ্টা অসন্তোষজনক ছিল। এ জন্য বুরো বাংলাদেশ নিয়মিত কর্মীদের নিয়ে একটি নিবেদিত DFS Team তৈরি করেছে এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করেছ।

কর্মী প্রশিক্ষণ: MFS প্রক্রিয়া সম্পর্কে মাঠ কর্মীদের সীমিত জ্ঞানের জন্য Piloting এর প্রথম পর্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ বিষয়টি অনুধাবন করে দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য বুরো বাংলাদেশ মাঠ পর্যায়ে ৯৬০০ এর বেশি কর্মীদের MFS প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

প্রকল্পের ফলাফল

বুরোর এমএফএস এর অবস্থা জুন, ২০২১ পর্যন্ত

- বুরো তার ১০৬১ টি শাখায় জানুয়ারি, ২০২১ থেকে এমএফএস পরিষেবা চালু করে।
- মাসভিত্তিক লেনদেন সংখ্যা ১,৪৫০ গুণ এর অধিক বেড়েছে, যা এপ্রিল, ২০১৯ এ ৪১৫ থেকে জুন, ২০২১ এ ৬ লক্ষ হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০২১ এ লেনদেন সংখ্যা ১৪.৫ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছিল, এরপর কোভিড-১৯ মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ের লকডাউনের কারণে লেনদেন সংখ্যা হ্রাস পায়।
- এমএফএস এর মাধ্যমে মাসভিত্তিক মোট লেনদেনের পরিমাণ এপ্রিল, ২০১৯-এ ১,৫৩৫ ইউএস ডলার বৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে জুন, ২০২১ - এ ৮০ লক্ষ ইউএস ডলার এ উন্নীত হয়।
- যদিও দুটি লকডাউনের সময় লেনদেনের সংখ্যা ও পরিমাণ মাসের প্রথম দিকে হ্রাস পেয়েছিল (মার্চ, ২০২০ এবং এপ্রিল, ২০২১), পরবর্তিতে উভয় সংখ্যায় মহামারির সময়ও সামগ্রিকভাবে বেড়েছে।
- এমএফএস এর সক্রিয় লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি কেবল পূর্ণ সংখ্যাতে নয়, বরং বুরোর সামগ্রিক ব্যবসায়িক আয়তনেরও একটি অংশ।

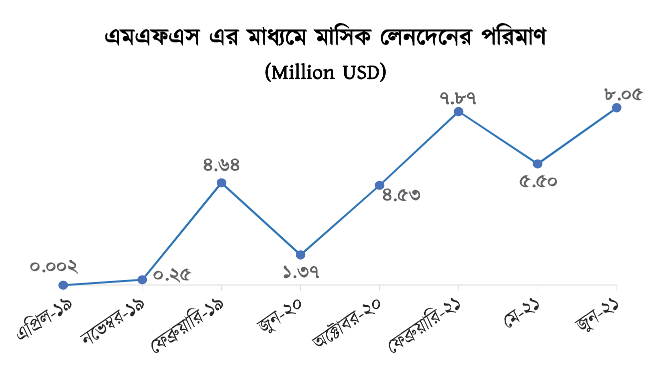

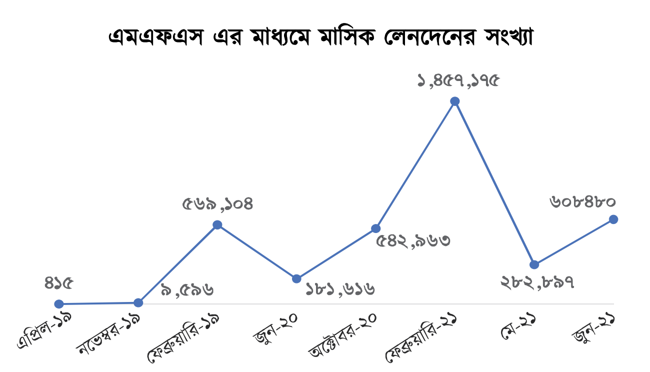

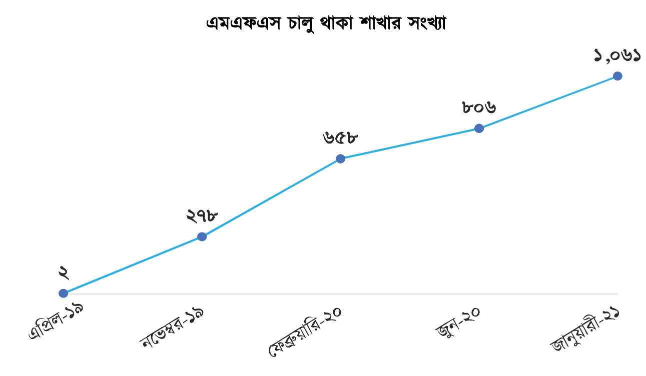

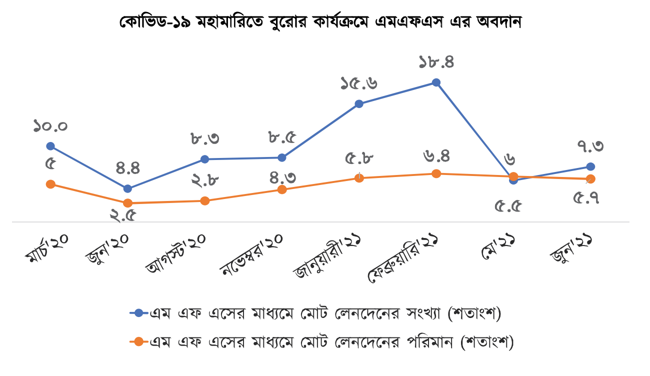

সদস্য প্রশিক্ষণ: Piloting এর প্রথম পর্যায়ের পর্যালোচনায় কর্মী ও সদস্য উভয়ের মধ্যেই MFS সংক্রান্ত সচেতনতার ঘাটতি চিহ্নিত হয়। বুরো বাংলাদেশ তার মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মী এবং নতুন যোগদানকৃত কর্মীর জন্য MFS প্রক্রিয়ার উপর প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করেছে। এই প্রশিক্ষিত মাঠকর্মী সদস্যদের MFS এর সুবিধা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষিত করে।

শাখা অটোমেশন: MFS Piloting এর প্রথম পর্যায়ে বুরো বাংলাদেশ একাধিক প্রযুক্তিগত ত্রুটির সম্মুখীন হয়েছিল। একটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত ভিত তৈরি করতে বুরো বাংলাদেশ তার MIS সিস্টেমকে আপগ্রেড করেছে MFS চালু করার আগে শাখার হিসাব রক্ষক কালেকশন সিটের সাথে আদায়কৃত টাকা ম্যানুয়ালি যাচাই করে পোস্টিং দিতেন। MFS প্রযুক্তিতে ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়াটিকে স্বয়ংক্রিয় করেছে। আগে বুরো বাংলাদেশ একটি কাগজভিত্তিক MIS সিস্টেমে কাজ করতো। এখন এটি তার সমস্ত শাখায় gBanker+ ডাটাবেজ স্থাপনের মাধ্যমে সামাধান করেছে। জুন, ২০২০ সালের মধ্যে বুরো বাংলাদেশ তার সমস্ত শাখাকে ক্রমান্বয়ে অনলাইন মোডে স্থানান্তরিত করেছে। শাখাগুলো এখন নতুন এই অনলাইন প্লাটফর্মে ইন্টিগ্রেটেড ইনভেন্টরি, ফিক্সড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং শাখার নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

অপর্যাপ্ত এজেন্ট উপস্থিতি: বুরো বাংলাদেশ MFS Piloting এর প্রথম পর্যায়ের জন্য একটি MFS প্রদানকারীর সাথে অংশীদারিত্ব করেছিল। বুরো বাংলাদেশের ভৌগলিক কর্ম এলাকার মধ্যে উক্ত MFS প্রদানকারীর উপস্থিতি সীমিত ছিল। বুরো বাংলাদেশের ভৌগলিক কর্ম এলাকায় শীর্ষস্থানীয় MFS প্রদানকারী, বিকাশ-এর এজেন্ট নেটওয়ার্ক-এর কার্যক্রম ও সহজপ্রাপ্যতা ব্যাপক, যা বুরো বাংলাদেশের সদস্যদের ক্যাশ ইন/ক্যাশ আউট অনেক বেশি সুবিধাজনক করেছে।

বিকাশ-এর সাথে অংশীদারিত্ব: ২০১৯ সালে বুরো বাংলাদেশ মোবাইলের মাধ্যমে সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণের কিস্তি আদায় সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিকাশ এর সাথে সহযোগিতা সম্পর্ক তৈরি করেছে। একটি সুপরিল্পিত মেলবন্ধন উভয় সংস্থার সিস্টেমের মধ্যে মসৃণ মিলন নিশ্চিত করেছে।

বুরো বাংলাদেশ এ মোবাইল আর্থিক পরিসেবাগুলো কি কাজ করে

বুরো বাংলাদেশ ২০১৫ সাল থেকে ডিজিটাল রূপান্তরের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করছে। যদিও এমএফএস পাইলটিংয়ের ১ম পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু বুরো বাংলাদেশ এর টিম তার লক্ষ্য অর্জন থেকে সরে যায়নি বরং তা সঠিকভাবে মোকাবেলা করছে। ২০১৯ সালে বুরো বাংলাদেশ একটি Dedicated MFS core Team নিয়োগ দিয়েছে। এই Team প্রথম দিকে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধান করে প্রতিষ্ঠানে MFS কার্যক্রমকে আরও বেগবান করেছে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল বুরো বাংলাদেশ তার MFS এর কার্যক্রমকে সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে তার IT ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছিল। বুরো বাংলাদেশ তার প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি, দক্ষতা ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের দূরদর্শিতা MFS পাইলটিংকে সফল করেছে।

ভবিষ্যতের করণীয় প্রসঙ্গে

আমরা বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে MFS কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য ২টি পদক্ষেপের পরামর্শ দিয়ে থাকি–

১. MFS এর সেবাগুলো চালু করার জন্য MFI গুলোর জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করা– যেহেতু বুরো বাংলাদেশ এর পাইলট প্রজেক্টে ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে, তাই এটি MFI গুলোর জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করার ক্ষেত্রে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি জন্য একটি কেস স্টাডি হয়ে উঠতে পারে। এই নীতিমালাগুলো MFI-কে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা তৈরি করতে এবং তাদের সদস্যদের জন্য MFS সেবা কার্যক্রম শুরু করতে উৎসাহিত করবে। এই কার্যক্রমটির বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের মধ্যে MFS সেবা গ্রহণে সহযোগিতা করবে।

২. ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রাহকদের জন্য লেনদেন খরচ হ্রাস করা- MSC এর প্রাথমিক গবেষণা প্রকাশ করে যে, ক্ষুদ্রঋণ সদস্যরা ১% লেনদেন ফি বর্ধিত সুদের হার হিসাবে উপলব্ধি করে। এই অতিরিক্ত চার্জ গ্রাহকদের MFS এর সেবা গ্রহণে বাধা দেয়। অংশীদারগণ, বিশেষ করে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা পাশাপাশি MFS সেবা প্রদানকারী এবং ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রাহকদের জন্য চার্জ কমানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করতে পারে। ক্ষুদ্র অর্থায়ন সদস্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে MFS গ্রহণ বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতিকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বৃহৎ আকারে প্রভাবিত করতে পারবে।■

ফল গাছের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

এ বি এম তাজুল ইসলাম

সময়ের বাস্তবতা ও চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশ এখন জীবিকানির্ভর কৃষি থেকে পদার্পণ করছে বাণিজ্যিক কৃষিতে। বাণিজ্যিক কৃষির এই অগ্রযাত্রার মূলে রয়েছে বিভিন্ন ফল-ফসলের আধুনিক জাত, উন্নত কলাকৌশল এবং বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি কার্যক্রম। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত হয়ে দেশের ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ এখন কৃষি কার্যক্রমে জড়িত হচ্ছেন এবং বিনিয়োগ করছেন উচ্চ মূল্যের ফল ফসলের বাণিজ্যিক কৃষি খামারে। যার ফলশ্রুতিতে দেশের কৃষি খাতে এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

বাণিজ্যিক কৃষির কার্যক্রম পরিচালিত হয় একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার আওতায় যেখানে ফসলের উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে অনুসরণ করা হয় আধুনিক কৃষির উন্নত কলাকৌশল। কিন্তু এখনও দেশের সিংহভাগ কৃষি কার্যক্রমই চলছে সনাতন ধারায়, ফলে আমরা আশানুরূপ ফলন পাই না। বিশেষ করে ফল-ফসলের ক্ষেত্রে এটি আরও বাস্তব। বাণিজ্যিকভাবে চাষকৃত বাগান ব্যতীত আমাদের দেশে প্রতিটি বসতবাড়িতে প্রচুর পরিমাণ ফলদ গাছ আছে যার বেশিরভাগই পরিচালিত হয় আল্লার ওয়াস্তে; মানে কোনো প্রকার যত্নআত্তি ছাড়াই গাছ বছরের পর বছর কিছু ফল দিয়ে যাচ্ছে যা গাছের মোট উৎপাদন সক্ষমতার অর্ধেক বা তারচেয়ে কম। অথচ সামান্য পরিচর্যা এবং কিছু কলাকৌশল অনুসরণের মাধ্যমে এই সকল ফল গাছের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব। সব ধরনের ফলদ উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই কিন্তু জনপ্রিয় কিছু দেশীয় ফলের উৎপাদন-শীলতা বাড়ানোর কলাকৌশল উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা হিসেবে এ নিবন্ধ।

যে কোনো ফল গাছকে অধিক উৎপাদনশীল করতে কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিষয় অনুসরণ করা আবশ্যক, যেমন:

- যেকোনো ফলের চারা রোপণের পূর্বে এর জাতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং মানসম্পন্ন উন্নত জাতের কলমের চারা রোপণ করতে হবে।
- ভূমিতে লাগানো গাছে বর্ষার আগে এবং পরে বছরে অন্তত ২ বার (সেপ্টেম্বর ও মে মাস) এবং টবে বা হাফ ড্রামে লাগানো গাছে প্রতি ৩ মাস অন্তর গাছের বয়স অনুযায়ী সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ভূমিতে চারা লাগানোর ক্ষেত্রে অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাথে গর্তের মাটির ৩ ভাগের ১ ভাগ এবং টবে চারা লাগানোর ক্ষেত্রে টবের মাটির ২ ভাগের ১ ভাগ জৈব সার ব্যবহার করতে হবে।
- গাছের ডালপালা বেশি ঝোপালো হয়ে গেলে পাতলা করে দিতে হবে যাতে ভালোভাবে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে। প্রতিবার ফল সংগ্রহের পর গাছের মরা রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে এবং ছাঁটাইয়ের পর একটি সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- প্রতিবছর একবার টবে লাগানো গাছের মাটি পরিবর্তন করতে হবে এবং গাছ পুনরায় টবে স্থাপনের আগে জৈব এবং রাসায়নিক সার সমৃদ্ধ মাটিসহ স্থাপন করতে হবে।
- গাছের গোড়া হতে চারপাশের ২ হাত পর্যন্ত জায়গা আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- কিছু ফলের ক্ষেত্রে মিলিবাগ খুব মারাত্তকভাবে ক্ষতি করে থাকে। যেমন আম, লিচু, কাঁঠাল, পেঁপে, পেয়ারার পাতা-কাণ্ড ব্যাপকভাবে মিলিবাগ দ্বারা আক্রান্ত হয় তাই মিলিবাগের নিম্ফ বা বাচ্চা যেন গাছের গোড়া থেকে ওপরের দিকে উঠতে না পারে সে জন্য পিচ্ছিল পলিথিন দিয়ে গাছের গোড়া টেপ দিয়ে মুড়িয়ে দিয়ে মিলিবাগের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আক্রমণের হার বেশি হলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করে দমন করতে হবে।
- রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের পরবর্তী ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত কোনো ধরনের ফল সংগ্রহ করা বা খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

আম

বাংলাদেশের জনপ্রিয় ফলের মধ্যে আম অন্যতম। ২-৪ টি আম গাছ নেই এমন কোনো বসতবাড়ি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। সাম্প্রতিক সময়ে বাড়ির ছাদেও প্রচুর আমের চারা রোপণ করা হচ্ছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বসতবাড়ি বা ছাদবাগানে স্থাপিত গাছ হতে প্রথম দু-একবার ভালো ফলন পেলেও পরবর্তীতে আর আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, নানাবিধ কারণে এটা হয়ে থাকে। আমের কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে হলে ওপরে উল্লেখিত অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো অনুসরণের পাশাপাশি আরও কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে–

- চারা লাগানোর পর প্রথম ও দ্বিতীয়বার আসা আমের মুকুল ভেঙে দিতে হবে, তৃতীয়বার থেকে সম্পূর্ণ মুকুল রাখা যাবে।
- চারা রোপণের পর পরই চারার গোড়ায় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে কিন্তু ফলন্ত গাছের ক্ষেত্রে মুকুল আসার ২ মাস পূর্ব হতে মুকুল আসা পর্যন্ত গাছে পানি বা সেচ দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে।
- আমের ডালে মুকুল আসতে হলে, ফুল আসার আগে ডালটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অধিক শর্করা ও কম নাইট্রোজেন দুই-ই থাকতে হবে। মুকুল আসার আগে গাছে সেচ দিতে থাকলে গাছের ডালে শর্করার চেয়ে নাইট্রোজেন পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ডালের ডগায় মুকুল আসার পরিবর্তে নতুন পাতা এসে যায় এবং গাছে মুকুলের সংখ্যা কমে যায়।
- গাছে মুকুল আসার পর গাছের গোড়ায় মাটিতে যেন রসের অভাব না হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে। এ সময় মাটিতে রসের অভাব থাকলে আমের মুকুল ও গুটি ঝরার পরিমাণ বেড়ে যাবে।
- আমের ফল ঝরা কমানোর জন্য আমের গুটি মটর দানা আকৃতি অবস্থায় ১ বার এবং মার্বেল আকৃতি হওয়ার পর আরেকবার প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশ্রিত দ্রবণ স্প্রে করলে ফল ঝরা অনেকাংশে কমে যাবে।
- আমের হপার পোকা ও অ্যানথ্রাকনোজ রোগ আমের ফলনের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। হপার পোকা আমের কচিপাতা ও মুকুল থেকে রস চুষে খায় এবং পরবর্তীতে এতে সুটি মোল্ড ছত্রাক জন্মে মুকুল কালো বর্ণ ধারণ করে দলা বেঁধে ঝরে যায় এবং আক্রান্ত মুকুল হতে আর ফল আসে না। অ্যানথ্রাকনোজ এর কারণে আমের পাতা, মুকুল ও ফলের গায়ে কালো দাগ পড়ে, মুকুল দলাবদ্ধ হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য গাছের রোগাক্রান্ত ঝরা পাতা, ফল কুড়িয়ে পুড়ে ফেলতে হবে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ইমিডাক্লোপিড গ্রুপের কীটনাশক ও কার্বনডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক দ্রবণ অনুমোদিত মাত্রায় একত্রে মিশিয়ে ৩ বার স্প্রে করতে হবে। প্রথমবার গাছে মুকুল আসার ১০-১৫ দিন পূর্বে দ্বিতীয়বার মুকুল আসার পর কিন্তু ফুল ফোটার পূর্বে তৃতীয়বার আমের আকার মার্বেল আকৃতি হওয়ার পর স্প্রে করতে হবে। তৃতীয়বার স্প্রে করার পর আমের ব্যাগিং শুরু করা যায়।
- আমের আকার ও রঙ আকর্ষণীয় করার পাশাপাশি আমের ফল ছিদ্রকারী পোকা ও মাছি পোকার আক্রমণ থেকে আমকে রক্ষা করার জন্য ফ্রুট ব্যাগিং খুব কার্যকরী একটি পদ্ধতি। ৪৫-৫০ দিন বয়সি আম ব্যাগিং করার জন্য উপযোগী হয়। মানসম্পন্ন আম পেতে হলে ফল সংগ্রহের ৩৫-৪০ দিন পূর্বে বাগানে ফেরোমেন ট্রাপ স্থাপনের মাধ্যমে আমে ফলের মাছি পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

লিচু

বাংলাদেশে জনপ্রিয় ফলের মধ্যে লিচু অন্যতম। কিছু আবহাওয়াজনিত বিষয় ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক সময়ে সঠিক পরিচর্যার অভাবে লিচুর শরীরবৃত্তীয় (Physiological) কার্যক্রমে ব্যঘাত ঘটে এবং ফলন কমে যায়। যেমন- গাছে ফুল ফল না আসা, ফল ঝরে যাওয়া, ফল ফেটে যাওয়া, ফলের আকার ছোট হওয়া এগুলো লিচুর ক্ষেত্রে খুব কমন সমস্যা। সমস্যা সমাধানে এর কারণ জেনে সঠিক সময়ে কিছু পদক্ষেপ নিলে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুব সহজ।

গাছে ফুল ফল না আসার বিষয়টি জাতের কৌলিকতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা ছাড়াও গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও অণুখাদ্যের অভাবে হতে পারে। এক্ষেত্রে ওপরে উল্লেখিত অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো অনুসরণের পাশাপাশি পাতায় অনুমোদিত মাইক্রো নিউট্রেন্ট দ্রবণ প্রয়োগ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে তবে এ সকল ব্যবস্থা কার্যকর না হলে বিষয়টি গাছের কৌলিকতাত্ত্বিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে ভালো উৎস থেকে নতুন চারা লাগাতে হবে।

লিচু ঝরে পড়ার কারণ: গাছে প্রয়োজনীয় হরমোনের অভাব বা তারতম্য, গাছের অপুষ্টি ও খরা, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ, ঝড়-বাতাস ইত্যাদি গাছের লিচু ঝরে পরার অন্যতম কারণ। এর প্রতিকার হিসেবে গাছে সুষম সার ও নিয়মিত সেচ দিতে হবে। অনুমোদিত মাত্রায় ২০% নাইট্রোবেনজিন (ফ্লোরা) বা ট্রাইকনটালন (মিরাকুলান) প্রয়োগের মাধ্যমে লিচুর ফল ঝরা কমানো যায় এক্ষেত্রে দ্রবণটি ২ বার স্প্রে করতে হবে প্রথমবার যখন ফল মটরদানার সমান হয় তখন এবং দ্বিতীয়বার যখন ফল মার্বেল আকৃতি হয় তখন প্রয়োগ করতে হবে।

লিচু ফেটে যাওয়া: উচ্চ তাপমাত্রা এবং নিম্ন আর্দ্রতা সম্পন্ন আবহাওয়ায় লিচুর শাঁস দ্রুত বাড়ে এবং সেই তুলনায় ফলের খোসা দ্রুত বাড়তে না পারার কারণে অনেক সময় ফল ফেটে যায়। এছাড়া লিচু পরিপক্ব হওয়ার সময় দিন ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে তারতম্য, শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করা এবং দীর্ঘ সময় বৃষ্টিপাতহীন থাকার পর হঠাৎ বৃষ্টিপাত হলে ফল ফেটে যেতে পারে। প্রতিকার হিসেবে গাছে ফল ধারণের পর থেকেই সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের গোড়া কচুরিপানা/খড় দ্বারা ঢেকে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে এতে গাছের শিকড় বাড়ে ও শক্তিশালী হয় এবং মাটিতে দীর্ঘ সময় রস ধরে রাখা যায়।

ফলের বৃদ্ধির সময় প্রতি লিটার পানিতে ১০ গ্রাম জিংক সালফেট এবং ২ গ্রাম সলুবোর বোরন মিশিয়ে ১৮-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে এছাড়া উদ্ভিদ হরমোন ২, ৪-ডি এর ১০ পিপিএম দ্রবণ ফল ধারণের পর গাছে স্প্রে করার মাধ্যমে ফল ফেটে যাওয়া রোধ করা যায়।

পেয়ারা

পেয়ারা উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর ফল। প্রায় সব রকমের মাটিতেই পেয়ারার চাষ করা যায়, তবে জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটি থেকে ভারী এঁটেল মাটি যেখানে পানি নিষ্কাশনের বিশেষ সুবিধা আছে সেখানে পেয়ারা ভালো জন্মে।

পেয়ারার ভালো ফলনের জন্য ফলবান বয়স্ক গাছে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে গাছের অঙ্গ ছাঁটাই করে সুষমভাবে সার প্রয়োগ করতে হবে এতে গাছে নতুন ডালপালা গজায় এবং প্রচুর ফল আসে। পেয়ারার খাড়া ডালে নতুন শাখা ও ফল কম হয় এজন্য খাড়া ডালের আগায় ওজন বা সুতলি বেঁধে টানা দিয়ে ডাল নুয়ে দিলে এতে প্রচুর শাখা গজায় এবং ফলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ব্যাগিং করলে সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি বাধাপ্রাপ্ত হয় এতে ফলে কোষ বিভাজন বেশি হয় এবং ফল আকারে বড় হয়। পেয়ারায় ব্যাগিং করার ক্ষেত্রে ৫০-৫৫ দিন বয়সি পেয়ারাতে ছোট ছিদ্রযুক্ত পলিথিন দিয়ে ব্যাগিং করতে হবে।

পেঁপে

পেঁপে গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই পেঁপের জন্য নির্বাচিত জমি হতে হবে জলাবদ্ধতামুক্ত এবং সেচ সুবিধাযুক্ত।

চারার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ২০-২৫ দিন বয়সের চারায় প্রতি লিটার পানিতে ১৫ গ্রাম ইউরিয়া সার মিশিয়ে স্প্রে করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। ভালো ফলন পেতে হলে পেঁপে গাছে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের পূর্বে গর্তের মাটিতে সুষম মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার একত্রে মিশিয়ে ২ সপ্তাহ রাখার পর চারা লাগাতে হবে।

চারা রোপণের এক মাস পর হতে প্রতি মাসে গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে এবং গাছে ফুল আসার পর থেকে এই মাত্রা দ্বিগুণ করতে হবে। হাফ ড্রামে লাগানো গাছে ও অর্ধেক মাত্রায় একই পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে এবং মাটিতে রস না থাকলে পরিমিত পরিমাণে পানি দিতে হবে।

সুষ্ঠু পরাগায়ণ ও অধিক ফল ধারণের জন্য পেঁপে বাগানের বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে ৫% পুরুষ গাছ রাখতে হবে।

মিলিবাগ পেঁপের জন্য খুব ক্ষতিকর পোকা। এর আক্রমণে আক্রান্ত পাতা ও ফলে সাদা পাউডারের মতো আবরণ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের পাতা ও ফলে শুঁটি মোল্ড রোগের সৃষ্টি হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে গাছ মারা যায়।

প্রতিকার হিসেবে আক্রমণের প্রথম দিকে আক্রান্ত পাতা/কাণ্ড থেকে পুরাতন টুথ ব্রাশ দিয়ে আঁচড়িয়ে পোকা মাটিতে ফেলে মেরে ফেলতে হবে এবং সপ্তাহে একবার প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম ডিটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে গাছে স্প্রে করলে মিলিবাগ হতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। আক্রমণ বেশি হলে ক্লোরোপাইরিফস বা ইমিডাক্লোপিড গ্রুপের কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

কমলা ও মাল্টা

মাল্টা/কমলার জন্য স্থান নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিন রোদ পড়ে এবং বৃষ্টির পানি জমে না এমন উঁচু বা মাঝারি-উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। মাল্টা/কমলার অধিক ফলনের জন্য ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পর ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে পারে। কারণ পার্শ্ব ডালগুলোতে ফল বেশি ধরে। কাণ্ডের এক মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে।

মাল্টা/কমলা চাষে ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় সেচ দিলে ফলের আকার বড় ও রসযুক্ত হয় এবং ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

মাল্টা/কমলা জাতীয় গাছের সাইট্রাস গ্রিনিং একটি মারাত্মক রোগ। সাধারণত রোগাক্রান্ত গাছের পাতা দস্তার অভাবজনিত লক্ষণের ন্যায় হলদে ভাব ধারণ করে। পাতার মধ্যশিরা হলদে হয়ে দুর্বল হওয়া, পাতা কিছুটা কোঁকড়ানো ও পাতার সংখ্যা কমে আসা, গাছ ওপর থেকে নিচের দিকে মরতে থাকা ও ফলের সংখ্যা কমে যাওয়া হলো এ রোগের প্রধান লক্ষণ। সাইলিডবাগ নামক এক প্রকার পোকা দ্বারা এ রোগ সংক্রমিত হয়। প্রতিকার হিসেবে বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গাছের গোড়া আগাছামুক্ত রাখতে হবে। মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার গাছের পাতা এবং গাছের গোড়ার মাটিতে ফেনিট্রোথিয়ন গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করে এ রোগ বিস্তারকারী সাইলিডবাগ দমন করতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে ডাল নিয়ে কোনো কলম করা যাবে না এতে নতুন গাছেও এ রোগ দেখা দেবে।

মাল্টা/কমলার ফলের খোসা মোটা ও রস কম হওয়া: জাতগত বৈশিষ্ট্যের কারণে, মাটিতে দস্তা বা ফসফরাসের ঘাটতি হলে এবং পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই ফল সংগ্রহ করা হলে এ সমস্যা হয়। প্রতিকারের জন্য সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম জিঙ্ক অক্সাইড অথবা ৫ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার পাতায় ও ফলে স্প্রে করতে হবে।

যেকোনো ফলদ গাছের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে বা এর ফল ধারণের পরিমাণ বাড়াতে হলে গাছের সঠিক পরিচর্যার পাশাপাশি যেকোনো সমস্যার সঠিক সমাধানের ক্ষেত্রে কৃষি বিজ্ঞানের আধুনিক কলাকৌশলের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই তা করতে হবে। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ বিষয়টি কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র এতে কেউ উপকৃত হলে সেটাই হবে সার্থকতা।■

● সহকারী কর্মকর্তা, কৃষি বুরো বাংলাদেশ

কবিতা

দেয়াল
ফারুক মাহমুদ

দেয়ালের কান আছে– এমন প্রবাদ
আমাদের সকলের জানা
ওর-ও যে চোখ-পিঠ আছে
সে-কথা খুব বিদিত নয়।

তাচ্ছিলে উড়িয়ে দিই দেয়ালের বেদনা-পাহাড়
চোখের জলের দাগ ঢেকে দিই অবজ্ঞার চুন-কালি দিয়ে

দেয়ালের পিঠ– সে তো কেনা দাস নয়–
শব্দহীন সয়ে যাবে অবিরাম বুটের আঘাত
দেয়ালের চোখ– সে তো চিরঅন্ধ নয়–
অশ্রুস্রোতে ঢেলে দেবে প্রাণঘাতী বিষ

খাদের কিনারে পৌঁছে, জন্মমৃত্যু এক হয়ে গেলে
দেয়ালের পিঠ জুড়ে জন্ম নেয় আগুনের গাছ
প্রতিটি তাকানো যেন রুদ্রবজ্রপাত

একাত্তরে আমাদের তা-ই হয়েছিল

প্রতি ইঞ্চি মাটি যেন গর্জে ওঠা দেয়ালের পিঠ
চোখে কোনো অশ্রু নেই– রক্তদ্যুতি, বারুদের ক্রোধ

যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, সত্য হলো বিজয়ের গান

সভা নেই, জনগণ
জাফর ওয়াজেদ

খেয়া ঘাটে মাঝি বসে আছে বৈঠায় হাত
পড়ন্ত বিকেলের সাথে গঞ্জে যাবে যারা
অথবা দুপুরে আসে যারা দূরযাত্রা শেষে
তাহাদের খেয়া ঘাটে বসে মাঝি শেষ গলুইয়ে
কৃষি জমি চাষহীন জলাভূমি যেন শুয়ে বিকৃত
স্পর্শ নামেনি দেহে কোনদিন কর্ষিত ছোঁয়ায়
বুকের খাঁজে রক্তিম রোদের ভিন্ন চুম্বন জাগে
দূরাকাশের জ্বলজ্বল নক্ষত্রের ঘোলাটে জলোচ্ছ্বাসে।

অথচ ছিল দিন উৎসবের, পরবের রজনীও
দল বেঁধে ভোর রাত নদী তীরে কুয়াশা ঘ্রাণ
নদীতে দল বেঁধে মাছেদের প্রিয় সাঁতার
রোজ জটলা বেঁধে ধরা দিত জালের গরাদে
জোৎস্নারাত ধ্বনি দিত দেহ মনে উত্তালে

বিকেলের মাঠে সমবেত মানুষের দল
কখনো সমস্বরে কখনো চিৎকারে মেলাতো কণ্ঠ
মুক্তির উদ্যানে সমবেত হাতের বাজাতো ডংকা
ঐকতান মূর্হুমূহু সংগ্রামে নাচাতো মন প্রাণ

দূর শহর থেকে শব্দ এসে যেতো দ্রোহের
জেলের জাল থেকে সড়াৎ করে নেমে যেতো মাছ
উঠোনে মাঠে এসে যেতো তরুণের গলা
দাবির মতো সোচ্চার মন্ত্রের মতো জোরালো
সুগভীর রোদের মতো আন্তরিক সময়
অন্নবস্ত্র-গৃহহীন জীবনের চরম উচ্ছেদে
ক্রমশঃ মাতাল চাঁদের মতো কখনো গুলি মিছিলে
রক্তের নদী বেয়ে গড়াতো পুকুরের জালে
জনসভা ধ্বনিত মিছিলের প্রকম্পিত উত্থানে
মুক্ত স্বপ্নের সাহসী জীবনের ভাষা হতো।

রোদ নেমে বৃষ্টি আসে, খেয়া ঘাটে বসে মাঝি
পারাপার নেই, যাত্রীও আসে না আর
গঞ্জের মানুষ সব কোথায় থমকে আছে
জনসভা নেই কোথাও, জনগণ নামে না মিছিলে
স্বপ্নহীন পারাপারহীন ঘৃণিত জীবনের ধারে
সব ঝরে গেছে সভাহীন স্লোগানের ঘায়ে-

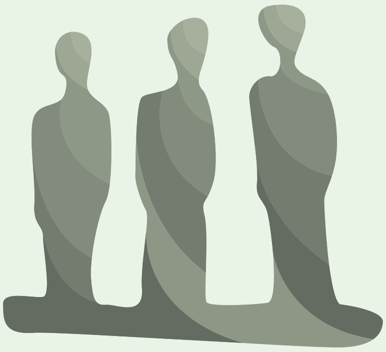

একলা মানুষ চাই
নাসরীন নঈম

তোমাকে অচেতন করে তবে কাছে নেব
আমি একাই তোমাকে ছোঁব
তুমি ছোঁবে না
তুমি জানবেও না আমি ঠিক
তোমার শরীরের কোথায় কোথায়
হাত রেখেছিলাম
আলতো করে ভালোবেসেছিলাম
বিছানা ছেড়ে মেঘের মতো উড়েছিলাম।

তুমি তো গৃহী মানুষ
যুগলে হাঁটো, যুগলে ঘুমাও, যুগলে চা খেতে যাও
আমার দিকে হাত বাড়াবে না
শুধু গোলাপ সখা হয়ে থাক।

আমি একজন একা মানুষ চাই
পবিত্র, স্নিগ্ধ অপাপবিদ্ধ যার চোখের চাওয়া
আগুন হয়ে আমাকে পোড়াবে
আমি একাই পুড়তে পুড়তে ছাই হবো।

তুমি শুধু দেখতে থাক কীভাবে
পৃথিবীর ঊর্ধ্বে কোনো নক্ষত্র আমাকে
কাছে টেনে নেয়।

চারটি অণু কবিতা
কাজল চক্রবর্তী

পৃথক ধর্মে
জলে ছিলো বসবাস কমল ও শাপলার
জমি ভাগ হলো জলভূমি তোলপাড়
ফুলের ধর্ম ছেড়ে এখন দেখি জলজরা
অধর্মে শ্বাস নিচ্ছে, খুনোখুনির হাহাকার।

অপ্রকাশ্য ঋণ
অবলুপ্ত হয়ে গেছে পঞ্চম চরণ
হয়তো বা ছোট হবে আরো পরিসরে
মিটে যাবে জীবনের অপ্রকাশ্য ঋণ
ভালোবাসায় ভাসুক তোমার জন্মদিন।

পাউরুটি
হাত নড়ে পা নড়ে এখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা টানটান
কপালের ভাঁজ দেখি, গলায় অনেকগুলো বেড়ি
বয়েস বেড়েই যায়, শঙ্কায় ভাবছো তুমি, এই মুড়ি
যদি মুচমুচে না হয়! শঙ্কামুক্ত হয়ে বলো, পাউরুটি দিন।

কিছু মিলবে না
শোন ঘুরে দাঁড়া ওপথে যাস না আমাদের মতো
মেঠো গরিবের রেডিমেড ক্যাশ অথবা কাইন্ড
কিছু মিলবে না– এই ভারতের সব গরিবেরা
তেমনি থাকবে যেমন দেখেছি আজাদীর আগে।

(পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)

ডাক
মাহমুদ হাফিজ

কোথায় সে আজ সাত সাগরের মাঝি
কত যে নাবিক ছুটে চলে পাল তুলে
মনজিলমুখী, জীবনটা রেখে বাজি
দেখলে না তুমি হাল টেনে গেলে ভুলে।

স্বপ্ন তোমার বুকে, হাতে ধরা হাল
খেয়া ছুটেছিল সামনেই বন্দর,
রাত শেষ হলে আলো দেখা দিত কাল
কেটে যেত বুঝি অন্ধকারের ঘোর।

হাল টেনে টেনে হতাশায় গেলে ডুবে
নতুন সফরে পথের হলো না শেষ,
রাত পোহাল না, ফুটল না আলো পূবে
দেখলে না মাঝি স্বপ্নের গড়া দেশ।

দরিয়ার ডাক: মাঝি ফিরে এসো ফের
রাত শেষে আজ বেলা উঠে গেছে ঢের।

ইঁদুর বিড়াল বিষয়ক
মুজতাহিদ ফারুকী

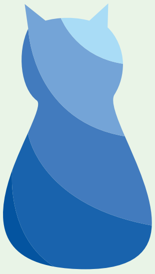

ইঁদুরের উৎপাত বেড়েছে কিচেনে।
একটা বিড়াল দরকার।
ঘরের হুলোটা ফুলবাবু, পড়ে পড়ে ঘুমায় ঝিমায়
কোথায় কোথায় যায়, কোথায় লাগায় জিভ চোখ
বেহদিস, হতে চায় নাকি বুদ্ধিজীবী!
খুঁজি তাকে ব্যালকনি, করিডোর, ভয়েডের গলির ছায়ায়
কোথাও দেখি না; তার চাই অধিক গোপন
চাই আরও ঘনিষ্ঠ আঁধার
ও বাড়ির মেনিটার সাথে খুব ভাব, গলাগলি
তোলা তোলা পেয়ে কবে ভুলেছে শিকার!
একটা বিড়াল দরকার।
গিন্নীর আলটিমেটাম ঝোলে ঘাড়ে।

মনের গহিনে অবহেলা
রকিবুল হাসান

এতটা কিভাবে পারো তুমি–আমাকে বঞ্চিত করে
একমুঠো স্নেহ কেড়ে নিয়ে বিলিয়ে বেড়াও
দূরের অচিন স্বার্থে–সাদাসিধে রূপালী রঙের
বুকের মরম কতোটা মমতা নিয়ে দূর বহু পথ ভেঙে
এসেছিল আমার জন্য–তুমি তা মূল্যহীন করে
ছড়িয়ে দিয়েছ স্বার্থের হিসেবি হৃদয়হীন অংকে।

এই মমতা যায় না অর্থে কেনা–তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে
ফেলে দেয়া যায় না স্নেহের পবিত্র পরশ। কীভাবে যে
কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত থেকে মুঠো ভরে আনা
কতো ভালোবাসা তুমি উড়ালে যে কতো জনে।

আমাকে তোমার মনে হয়নি কখনো কিছুতেই;
কী অদ্ভুত– ভালোবাসার গল্প শোনাও
তোমারই রক্ত আমি–কী শান্তি তোমার আমাকে
ভালোবাসার বিলাসী গল্পে মনের গহিনে অবহেলা গেঁথে।

আমি
কামরুজ্জামান

প্রতি প্রত্যুষে আমার আমি থেকে একটি একটি করে
অহংকারের পালক খুলে খুলে নিক্ষেপ করি -
কামারশালার হাপরের নীলাভ শিখার অগ্নিকুন্ডে
পুড়ে পুড়ে ছাই ভস্ম হয়ে মিশে যায় আকাশে-বাতাসে
আমিকে নিয়ে যাই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্মের বিবরে
মানুষ কত অসহায় পড়ে আছে রাত্রির উদরে।

দিন শেষে আবার ভেতরে ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে
বহু বর্ণীল অহমের লতাগুল্ম বৃক্ষ ডালপালা
মোহ মায়াজাল ফেলে চৈতন্যে নিয়ে আসে
কাম ক্রোধ মাৎসর্য বিত্তবৈভব যাবতীয় লিপ্সা।

ছুটে আসে স্বপ্নের ঘোড়া, সোনালী মায়ামৃগ
একটি করে ডিম পারে সোনার রাজহাঁস।
রাজকন্যা ডালিমকুমার, লাইলী মজনু
ইউসুফ জুলেখা, মারমেইড, রুমিও জুলিয়েট
ঝকমক করে ওঠে রাজ প্রাসাদ রাজপুত্র
সিংহাসন যুদ্ধবিদ্যা রণকৌশল রক্তপিপাসা...

অন্ধকার থেকে আমিকে আবার নিয়ে আসি
আপন ঘরে আবার এক এক করে পালক
বিচ্ছিন্ন করে ছুড়ে দেই লেলিহান শিখায়
নিমিষেই ছাই ভস্ম হয়ে উড়ে যায় বাতাসে
তারপর আমিকে নিয়ে যেতে থাকি আলোর দিকে...

ভুল হিসেবের কাল
ফরিদ ভূঁইয়া

খেদ থেকে জেদ– পুষতে ভালোই জানো

জেদ ফেটে অঙ্কুরিত হলে
ভেদজ্ঞানে তোমায় কী নামে ডাক দেবো?

গোমরা মনের ঘুমড় আঁধারের চুম;
আলোক দিনের সূর্য গেলো চুরি– তুমি অপরাধী

প্রতিবাদে ক্রুদ্ধ চোখে নক্ষত্র অযুত
সৌর সভায় মিলেছে আজ;
তাদের বিম্বিত ক্ষোভ আমার ভেতর
ক্ষোভ থেকে খুব ঝড়, বইছে অফুরান!

তক্কে-সখ্যে যাপন জীবন, ভুল হিসেবের কাল;
ঘি বিকিয়ে তামাক খরিদ, বাড়ছে ভুলের দিন
খামখেয়ালির দিন– এক, দুই, তিন

খেদ থেকে জেদ– পুষতে ভালোই জানো!

একটি অভাবিত মৃত্যু

ইকবাল হাসান

বাইরে কনকনে শীতের রাত।
আর এই রাতে লঞ্চ থেকে নেমে সে কোথায় যাবে? যদি পরিচিত কারো দেখা না পায়, যদি ঘাটে নিদেনপক্ষে একটি নৌকাও অপেক্ষা না করে তার জন্য! করার কথাও নয়, নিশ্চয়ই অপেক্ষার ক্লান্তি নিয়ে ফিরে গেছে। এতো দেরি করে ফেলেছে বেতাগী-বরগুনা লাইনের লঞ্চ। এমন হবার কথা নয়, তবু হলো, নলছিটি ছেড়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই এক বিকট চিৎকার তুলে বসে গেল ইঞ্জিন। তারপর ঘণ্টাতিনেক নদীর জলে ভেসে থাকা।
এক সময় কেবিন থেকে বেরিয়ে সে দেখে বাইরে অন্ধকার, সন্ধ্যার ফ্যাকাশে আঁচল সরিয়ে দিয়ে নেমেছে রাত, আর রাতের আকাশে অজস্র তারার ভিড়। তখন হামিদা বানুর সতর্কীকরণের কথা মনে পড়লে হতাশা এবং অনিশ্চিত রাতের ভাবনা কিঞ্চিত আতংকিত অস্থির করে তুলে তাকে।
ঠিক এ সময় বারকয়েক ভটভট শব্দ তুলে লঞ্চটি পুনরায় চলতে শুরু করলে সে দেখে, ধীরে ধীরে সরে যাওয়া দুপাশের স্থির গ্রাম ও একটি রাতকানা পাখির অন্ধকার দুভাগ করে মাথার ওপর দিয়ে শব্দহীন উড়ে যাবার দৃশ্য।
হামিদা বানু, তার স্ত্রী, স্মার্ট, প্রতিটি ভবিষ্যৎ যেন পরিষ্কার আগাম দেখতে পায়; বেরুনোর সময় বলে, গ্রামে না গেলে হয় না? ওখানে তো কেউ নেই, কিছু নেই এখন। বিষখালী সব খেয়ে ফেলেছে সেই কবে।
শামীম চুপ করে থাকে, জবাব দেয় না। হামিদা বানু বলে, বাবার কবর কি তুমি এখন আর খুঁজে পাবে? এতো বছর পর? প্রায় অচেনা ওই গ্রামে গিয়ে কী দেখবে তুমি? নদীভাঙন? বাঁশঝাড়, সুপারি বাগান? গ্রামের সিন-সিনারি নিরন্ন মানুষের ভাঙাচোরা মুখ? কিছুই অবশিষ্ট নেই আজ....
'অই কিছু না থাকার দৃশ্যই দেখতে চাই, আবার কবে না কবে আসা হয়,' হামিদা বানুকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে শামীম বেরিয়ে গেলে সে ওই যাত্রাপথে একটি নিস্ফলা রাত্রির ছবি ভেসে উঠতে দেখে। পেছনে তাকায় না শামীম, অতএব হামিদা বানুর ঠোঁটে ভেসে ওঠা স্মিত হাসির রেখাটি দেখা হয় না তার।
সাকিন বদলে গেছে। ফলে দীর্ঘকাল গ্রামে আসা হয় না, কিন্তু এই না-আসার মধ্যেই কি লুপ্ত হয়ে যায় গ্রাম? অচেনা হয়ে যায় নদী, মাটি আর জলের ঘ্রাণ, পেঁচার ডাক, বাদুরের উপড়ে যাওয়া, পুকুরের সিঁড়ি, কাতল ও রুইয়ের উত্থান? না থাক বাঁশঝাড়, সুপারি বাগান, না থাক বাদাম গাছের নিচে বাবার কবর, বাদুরতলা নামটি তো তার হৃদয় থেকে মুছে যায়নি আজো। শামীম জানে, কাছাকাছি গেলে তবে সে ঠিকই ওই জলের ঘ্রাণ আর অনতিদূরের ঘন বৃক্ষরাজির অতল অন্ধকার থেকে একটু একটু করে জেগে উঠতে দেখবে তার গ্রামের কঙ্কাল।
এই যেমন এখন, এই যাত্রাপথে, গ্রামের কথা মনে করতেই তারাবাতি ও একটি কুকুরের কথা স্মরণ হয় তার।
বাদুরতলা গ্রামে কুকুরের লেজে তারাবাতি সবাই ওই প্রথম

দেখে, স্বাধীনের দিন। অইদিন দিবাগত রাতে ডরকোলার সোহরাব মাস্টারের বাড়ির উঠানে 'জয়বাংলা'র খাওন চলাকালে একটি নেড়ি কুকুরকে লেজে তারাবাতির ঝিকিমিকি নিয়ে ছুটে যেতে দেখা যায়। পুরো গ্রাম তখন মৌ মৌ করছে মুক্তির আনন্দ আর ভুনা খিঁচুড়ির ঘ্রাণে, আর তারাবাতি–মাঝপথে নিভে যাওয়া কুকুরের লেজে ঐ তারাবাতি দেখে 'পোলাপান বড় শয়তান'–কারো কারো এই মন্তব্যের ভেতর কুকুরটি সোহরাব মাস্টারের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়।

দৃশ্যটি মনে করে হেসে ফেলে শামীম।

লঞ্চ থেকে নেমেই সে টের পায় নিথর জনমানবহীন চারদিক। স্টেশনে নেমে আসা যাত্রী সে একা। ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাওয়া লঞ্চের শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দধ্বনির অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই; না পাখির ডাক, না বাতাসের, না নদীর জলের শব্দ! শুধু অতি দূরে নদীর ওপাড়ে বনজঙ্গলের ভেতর ক্ষীণকায় একটি আলোর আভা চোখে পড়ে তার। মল্লিকের হাটের দোকানপাটে কোনো সাড়াশব্দ নেই মানুষের, সব আলো নিভে গেছে। এ কোন্ বিরান ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে সে?

হাটের দোকানের একটি ছাপরার নিচে এসে দাঁড়ায় শামীম। চারদিক খোলা থাকায় হু হু করে বইছে উত্তরের বাতাস। আর এই বাতাসের ভেতর কুন্ডুলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকা একটি কুকুর মধ্যরাতে তার রাজ্যে অনাহুত অতিথির আগমনে জেগে ওঠে এবং অসম্ভব বিরক্তির চোখে একবার তাকিয়ে বারদুই কুঁইকুঁই করে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ে। একটি ঘুমন্ত প্রাণীর পাশে পুনরায় একা হয়ে যায় শামীম। সহসা তার চোখ পড়ে খালের মুখে বাঁধা নৌকাটির দিকে। সে এগিয়ে যায়, গিয়ে দেখে, ভেতরে ছইয়ের নিচে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে একটি মানুষ। আশ্চর্য ধীরকণ্ঠে ডাকে শামীম আর তাতেই ঘুমের গুহা থেকে যেন জেগে ওঠে মানুষটা।

'নাও আইজ আর যাইবো না।'

এ কথা শোনার পরও শামীম নৌকায় উঠে বসে আর তখনই কাশি শুরু হয়ে যায় মানুষটার–রাতের নিস্তব্ধতা টুকরো টুকরো করে গগনবিদারী কাশির শব্দ ছড়িয়ে পড়ে নদীর জল ও জ্যোৎস্নার ভেতর। কী তার করণীয় সহসা বুঝে উঠতে না পেরে পিঠে হাত রাখে লোকটার। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। পরপর দুবার বমি হয় তার–রক্তবমি। শামীম দেখে, কাশির শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠে কুকুরটি এখন খালের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

'যদি বাঁচি তয় কাইল যামু রাজাপুর। ডাক্তারের কাছে'-বলে জল ও জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে থাকে লোকটা।

বাবার কথা মনে পড়ে শামীমের। কাশির অসুখ ছিলো বাবারও। অন্ধকারে আকাশে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, সুপারি বাগানের ভেতর একা একা হাঁটতেন– সেই বাবাকে পাওয়া গেল এই বিষখালী নদীর পাড়ে একাত্তরের মাঝামাঝি এক ভোরবেলা। বুক তার এফোঁড়-ওফোঁড়, রক্ত আর জল-কাদায় একাকার। শামীমের মনে পড়ে.... শরীর থেকে রক্ত, জল, কাদা ধুয়ে-মুছে সাদা কাফন পরে নিলেন বাবা, তারপর কবর খোঁড়ার অপেক্ষায় টিনের চালের দিকে মুখ রেখে ছোট পায়ার খাটে স্থির শুয়ে থাকলেন। অপেক্ষা বড় বাজে ব্যাপার। বিরক্তিকর, মৃত মানুষের জন্যও।... কিন্তু কবরের পানি তো আর শেষ অইতাছে না– এই কথা যেন বাবাও শুনতে পাচ্ছেন, অতএব যেন তিনি সিমেন্টের শীতল মেঝের ওপর শুয়ে থাকাই মনে করলেন যুক্তিযুক্ত।

কবর খোঁড়ার পর দেখা গেল তলদেশ থেকে পানি উঠছে শুধু। এমনিতে দুদিন বৃষ্টি ছিল খুব, কিন্তু এখন তো বৃষ্টি নেই, তা হলে এত পানি আসে কোত্থেকে?

কবরের তলদেশ থেকে পানি উঠছে তো উঠছেই! গোরখোদক দুজন বালতি ভরে ভরে সেই পানি ঢেলে দিচ্ছে পুকুরে দিকে। কবরের পানি কখনো আঁকাবাঁকা কখনো সোজা হয়ে নেমে গিয়ে মিশে যাচ্ছে পুকুরে। আর সেই দৃশ্য, সেই পানি ওঠার দৃশ্য দেখার জন্য নানা দিক থেকে ছুটে আসে মানুষ, 'আল্লার কী অসীম কুদরত', 'মল্লিকবাড়ির বাদাম গাছের নিচে আবে-যমযমের কুয়া পাওয়া গেছে'– তবে পানি দেখে এই ভ্রম অচিরেই কেটে যায় তাদের এবং কবরের কাছে ছুটে আসা মানুষেরা সেই কাদা মিশ্রিত ঘোলা পানি সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকে।

এক সময় বৃদ্ধ আফসার উদ্দিন 'মৃতের রুহু কষ্ট পাইতাছে', 'তোমাগো কি চোখ-কান নাই'–বলে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে কবরে কয়েক বস্তা বালু ঢালার পরামর্শ দিলে কাজ হয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি বন্ধ হয়ে গেলে বাবা কবরের অভ্যন্তরে অনন্তকালের জন্য শুয়ে পড়েন।

শামীমের চোখ ভেসে যায়, সে নদী ও জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া অস্পষ্ট পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করে বাবার কবরটি এখন কোথায়? কিছুই স্পষ্ট হয় না, সবকিছু বরং অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে। চোখ ভেসে যায় শামীমের...

চাঁদ মধ্যরাতে আকাশের মাঝখানটা দখল করলে খালের পানিতে সরাসরি প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। তার সামনে দু'হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে বসে থাকা নির্জীব মানুষটির কথা এতোক্ষণ ভুলে ছিল সে, হঠাৎ দু'হাঁটুর আড়াল থেকে মাথা তুলে খালের ভেতর ফুটে থাকা চাঁদের দিকে তাকাতে দেখে শামীম। তখন প্রশ্নটা করে তাকে, 'সংসারে আর কে কে আছে আপনার' আর এই প্রশ্নে যেন পালিয়ে যেতে চাইল, 'কেউ নাই বাজান, কেউ নাই', তারপর দু'হাঁটুর মাঝখানে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠলো সে। তখন তার এই কান্নার সঙ্গে বুকভাঙা কাশির শব্দ রাত্রির নৈশব্দের ভেতর আর্তনাদের মতো শোনায়। সে তখন তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। পারে না। বুকের ভেতর থেকে ঘড়ঘড় শব্দ ওঠে, পুনরায় রক্তবমি শুরু হয় তার। আর এর ভেতর, শামীম শুনতে পায় বিড়বিড় করে সে বলছে... পোলাডা আইজ বাঁইচা থাকলে শেখ মুজিবরের মতো বুকের পাটা অইত...সরোয়ার্দির মাঠে অই ডাক যহন হুনলো পোলাডারে আর ঘরে রাহনই গেল না... একদিন ভোররাইতে মুলিবাঁশের বেড়া ঠেইলা ঘরে ঢুইকা বাপজান কইলো ওপাড়ে যাইতাছি, আইজই, আমারে আটকাইতে পারবা না... হেই মুক্তি আইলো, স্বাধীন আইলো, আমার বাপজান তো আর ফিইরা আইলো না....।

চোখের পানি আর পিচুটি দিয়ে দৃষ্টির সামনে ঝাপসা এক দেয়াল তুলে চাঁদের আলোর নিচে নৌকার পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়ে সে।

শামীমের তখনো জানা হয় না যে, এই শীতঘুম থেকে আর কোনোদিনও জেগে উঠবে না মানুষটি।■

পুঠিয়া শিবমন্দির

প্রথমবার পুঠিয়া রাজবাড়ীর কথা শুনেছিলাম গাড়িতে বসে, রাজশাহী-পাবনা মহাসড়কে, বছর দুয়েক আগে। গন্তব্য উল্টো দিকে হওয়ায় সেবার যাওয়া হয়নি। কিন্তু এবার আমাদের যাত্রাপথটাই ছিলো পুঠিয়া রাজবাড়ী ঘেঁষে। তবে গন্তব্য দূরে হওয়ায় মানসিক প্রস্তুতি ছিলো গাড়ি থেকে চট করে নেমে পট করে কিছু ছবি তোলার। কিন্তু রাজবাড়ীর একটু আগেই বড় শিবমন্দিরটি চোখে পরায় রাজবাড়ীর ছবি তোলার পরিকল্পনা বিসর্জন দিতে হলো। কারণ এতো উঁচু মন্দির এর আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পরে না। স্থানীয়রা বলে এটাই এশিয়ার সবচেয়ে উঁচু শিবমন্দির। তবে এ তথ্য কতটা সঠিক তা নিয়ে কিছুটা প্রশ্ন আছে। কারণ গুগুল করে যতটুকু দেখেছি, তাতে এর চেয়েও বড় শিবমন্দির পাশের দেশ ভারতেই আছে। সে হিসেবে এটিকে বলা যায় এশিয়ার অন্যতম উঁচু শিব মন্দির। তো, গাড়ি থেকে নেমেই দৌড় দিলাম মন্দিরের পেছনে শিবসাগর নামের বিশাল দীঘিটার দিকে। সূর্যের অবস্থান যদিও ফটোগ্রাফিক নিয়মের প্রতিকূলে ছিলো, তবুও ঝুঁকি নিয়েই ক্লিক করলাম। মন্দিরের সামনের দিকটা গাছ, বাড়িঘর আর দোকানপাটে সংকীর্ণ হয়ে গেছে; পেছনটা আবর্জনায় ভর্তি। তারপরও দীঘির ও-প্রান্ত থেকেই ছবির ফ্রেমটা সবচেয়ে ভালো পাওয়া যাচ্ছিলো। ছবি নেওয়ার পর অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম মূল মন্দিরে। ততক্ষণে আমার ফটোগ্রাফিক সঙ্গী রাজশাহীর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান ভাই ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য শিবলিঙ্গ স্থাপিত মন্দিরের গর্ভকক্ষ খোলার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। পুরো মন্দিরে এটাই একমাত্র কক্ষ। অধিকাংশ সময়ই এর দরজায় তালা ঝুলে, সেই সাথে চারজন সশস্ত্র আনসার সদস্যের নজরদারি। কারণ বুঝতে বেশিক্ষণ লাগেনি। ভেতরে রাখা আছে কষ্টি পাথরের বেশ উঁচু একটি শিবলিঙ্গ, উচ্চতা সাড়ে ৬ ফুট, অর্থের মানদন্ডে অতি উচ্চ মূল্যের। কেয়ারটেকারের কথায় বুঝলাম, দর্শনার্থীদের জন্য সহসা এ কক্ষ খোলা হয় না।

তবে আমরা যেহেতু দূরের মানুষ তাই খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা, দরজা খুলে যাওয়ার পেছনে আমাদের হাব-ভাবের একটা প্রভাব ছিলো! যাই হোক, তালা খুলে গেলো, আমরা ভেতরে গেলাম, ছবি তুললাম।

এবার কিতাবি কথায় আসি। ব্রিটিশ-বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং সবচেয়ে সম্পদশালী পুঠিয়ার এই জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জমিদার পীতাম্বর। ১৮২৩ সালে তৎকালীন ৩ লক্ষ টাকা খরচ করে এই শিবমন্দিরটির নির্মাণ সূচনা করেছিলেন পুঠিয়ার পাঁচআনির জমিদার রানী ভুবনময়ী দেবী। শেষ হয়েছিলো ৭ বছর পর ১৮৩০ সালে। এ কারণে মন্দিরটি 'ভুবনেশ্বর' মন্দির নামেও পরিচিত। উঁচু ভিতের ওপর নির্মিত বর্গাকৃতির এই মন্দিরের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৬৫ ফুট এবং উচ্চতা ১১৪ ফুট। মন্দিরের চারকোণায় চারটি এবং মাঝে একটি রত্ন বা গম্বুজ আছে। ফলে এটি পঞ্চরত্ন মন্দির। এই পাঁচটি রত্নে ছোট ছোট ১৭৭টি চূড়া আছে। মূল মন্দিরের দেয়ালজুড়ে পৌরাণিক কাহিনির চিত্র অঙ্কিত ছিলো কিন্তু কালের বিবর্তনে সেগুলো আর নেই। একই সাথে ধ্বংস হয়ে গেছে নকশা খচিত মূল দরজাটিও। ১৯৪৯ সালে মন্দিরটি একবার সংস্কারও করা হয়েছিলো। কিন্তু ৭১-এ মন্দিরটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়, বুলেট দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয় এর দেয়াল। এ কারণে দেয়ালে থাকা শিব মূর্তি ও গর্ভকক্ষে অধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটির ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। পরে ১৯৭৮ সালে সংস্কার করে শিবলিঙ্গটিকে পুনরায় অধিষ্ঠিত করা হয়। এই শিবমন্দিরের পাশেই আছে ষড়ভূজাকৃতির একটি জগন্নাথ মন্দির।

সামনাসামনি না দেখলে এই মন্দির দুটোর বিশালতা উপলব্ধি করা সত্যিই কষ্টকর। মন্দিরটি সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষণে রয়েছে।■

● লেখা ও ছবি
বিদ্যুত খোশনবীশ, নির্বাহী সম্পাদক, প্রত্যয়

বুরোর ঋণে সফল লাইজা বড়ুয়া

শরীফ হাসান চৌধুরী

খুব অল্প বয়সে প্রাইমারি স্কুলের গন্ডি পার হতে না হতেই বিয়ে হয়ে যায় লাইজা বড়ুয়ার। প্রায় ২৫ বছর আগে জীবনের কঠিন বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে স্বামীর সংসার শুরু করেন তিনি। লাইজা বড়ুয়া ও সুনীল বড়ুয়ার দম্পতির ৪ সন্তান ও শাশুড়ি নিয়ে বাঁশখালী উপজেলার শীলকূপ ইউনিয়নের বড়ুয়া পাড়া গ্রামে বসবাস। লাইজা বড়ুয়ার ৭ জনের অভাব-অনটনের সংসার। স্বামী সুনীল বড়ুয়া (৪৫) পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। একজনের আয় দিয়ে পরিবারের ঠিকমতো খাবার জোটে না। রাজমিস্ত্রি কাজের পাশাপাশি নিজের সামান্য জমিতে সবজির চাষ করেন। পুঁজির অভাবে সবজি চাষও ভালোভাবে করতে পারে না। সংসারে অভাব ও আয় রোজগার না থাকায় বড় দুই ছেলেকে লেখাপড়া বন্ধ করে বাবার সাথে কাজে নিয়ে যায়। যাতে সংসারের কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতা আসে এই আশায়। শত প্রতিকূলতার মাঝেও লাইজা বড়ুয়া নিজের পরিবারকে আগলে রাখার চেষ্টা করেন। বড় দুই ছেলেকে লেখাপড়া করাতে না পাড়ায় তার বুকের মধ্যে চাপা কষ্ট সবসময় অনুভব করেন। আবার স্বামীর একার পক্ষে সংসারের ঘানি টানাও সম্ভব হয়ে উঠছিল না। এভাবে চলছে লাইজা বড়ুয়ার জীবন সংগ্রামের তীব্র লড়াই। ২০১৯ সালে প্রথম পরিচয় হয় বুরো বাংলাদেশের কক্সবাজার অঞ্চলের বাঁশখালী শাখার এক কর্মীর সাথে। সবকিছু দেখে লাইজা বড়ুয়াকে ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে যাত্রায় ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ভাঙা ও জরাজীর্ণ ঘর মেরামত করেন। সবজি চাষের জন্য দ্বিতীয়বার আবার বুরো বাংলাদেশ এর বাঁশখালী শাখা থেকে ৪৫ হাজার টাকা ঋণ নেন। এবার আগের তুলনায় সবজি চাষে বেশি বিনিয়োগ করলেন। সবজি ভালো ফলন ও ভালো দাম পাওয়ায় বেশ লাভ হয়। এর পর লাইজা বড়ুয়ার পরিবারকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আস্তে আস্তে পরিবারে স্বচ্ছলতা দেখা দেয়।

লাইজা বড়ুয়ার বাড়িতে খাবার পানি বা নিরাপদ পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। অন্যের বাড়ি থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয়। বৃদ্ধ শাশুড়ি ও সন্তানসহ পরিবারে জন্য স্বাস্থ্যসম্মত কোন পায়খানা নেই। ফলে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বা রাতের বেলায় প্রকৃতির কাজে সারা দিতে বেশ কষ্ট হতো পরিবারের সকলের। এরই মধ্যে এক দিন বুরো বাংলাদেশ বাঁশখালী শাখার শাখা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জানতে পারলেন। লাইজা বড়ুয়া বুঝতে পারলেন কয়েক দিন পরপর তারাও পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা না থাকায় অনেক আপনজনও তার বাড়িতে তেমন থাকতে আগ্রহ দেখায় না। পাশাপাশি তিনি আরও জানলেন, বুরো বাংলাদেশ সদস্যদের নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের জন্য স্থাপনা তৈরি করতে ঋণ প্রদান করে থাকে।

বাড়িতে এসে স্বামী ও পরিবারে সদস্যদের সাথে পরিবারে জন্য নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা নিয়ে কথা বলেন। পরিবারের সদস্যদের সম্মতিতে বুরো বাংলাদেশ এর বাশখালী শাখা থেকে নতুন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের জন্য ১০ হাজার টাকা ঋণ নেন। ঋণের টাকার সাথে নিজেদের জমানো কিছু টাকা স্বামীর হাতে তুলে দেন। পাশাপাশি সবজি বিক্রির টাকা দিয়ে পায়খানা থেকে ৩০ফিট দূরে নিরাপদ পানির জন্য একটি নলকূপ স্থাপন করেন। এর ফলে লাইজা বড়ুয়ার পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের পাশাপানি নিরাপদ পানি পান করার নিজস্ব সুযোগ তৈরি হয়।

আগের তুলনায় লাইজা বড়ুয়ার পরিবার বেশ ভালো আছে। তার ঘরে এখন আর অভাব নেই। বড় মেয়ে স্থানীয় একটি স্কুলে ৭ম শ্রেণিতে আর ছোট ছেলে ২য় শ্রেণিতে পড়ে। এই দম্পতি এখন সুন্দর জীবনের আরও বড় স্বপ্ন দেখছে।

লাইজা বড়ুয়া বলেন, বুরো বাংলাদেশ আমার সুখ দুঃখের সাথে আছে। বুরো বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞ।■

● প্রকল্প মনিটর, ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্প
চট্টগ্রাম অঞ্চল, বুরো বাংলাদেশ

শিউলি'র পরিবর্তনের গল্প

কায়সার আলী সৈকত

সুলতানা ইসলাম শিউলি নাগরপুর ইউনিয়নের কাশদহ গ্রামের মো. জামাল উদ্দিন মামুন এর সহধর্মিনী। স্বামী, ২ কন্যা, ননদ এবং শাশুড়িসহ ৬ সদস্যের পরিবার। তার স্বামী ছিলেন ভাড়ায় চালিত একজন অটোরিক্সা চালক যার দরুন সারাদিনের আয়ের বেশিরভাগ অটোরিক্সার মালিককে দিয়ে দিতে হতো। এতে সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকতো– ফলে সংসার পরিচালনা করা বড়ই কষ্টসাধ্য ছিল। সংসারের এই অবস্থা দেখে শিউলি বেগম উপলব্ধি করেন স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে সংসারটা সচ্ছল করে তুলবেন। এরপর তিনি স্বামীর সাথে আলোচনা করে তার গহনা বিক্রির টাকা এবং তার বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা এনে তার স্বামীকে ১টি অটোরিক্সা কিনে দেন এবং বুরো বাংলাদেশ এর নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তার বাড়ির সামনেই একটি মুদি দোকান দেন এবং ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসা শুরু করেন, পাশাপাশি গবাদি পশু ও মুরগি পালন করেন– এভাবে তিনি তার সংসারকে সচ্ছলতার সাথে পরিচালনা করে আসছেন। গত জুন মাসে বুরো বাংলাদেশ এর নাগরপুর-২ শাখা থেকে তাকে সমাজের মানুষের স্বাস্থ্যগত বিষয়ে সচেতন করার জন্য কাজ করার কথা বলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সমাজে তার আরো একটি পরিচয় প্রকাশ পায় সেটি হলো, তিনি বুরো বাংলাদেশের 'মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি' প্রকল্পের একজন কো-হেলথ এডুকেটর।

গত ১৯ অক্টোবর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি থেকে তিনি মোট ৪ দিনের প্রশিক্ষণ পান। এই প্রশিক্ষণ থেকে তিনি অনেক বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন যেমন- মাতৃত্বকালীন সেবা ও নবজাতকের যত্ন, সুষম খাবার, কিশোর-কিশোরী স্বাস্থ্য, হাত ধোয়া, যৌন রোগ ও সেবা, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, কোভিড-১৯সহ নানা বিষয়। প্রশিক্ষণ শেষে তার যে উপলব্ধি হয়েছে তা হলো দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা, পারিবারিক ও সামাজিক কুসংস্কার এবং অল্প শিক্ষার কারণে এতদিন কত অসচেতন এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই না তারা বসবাস করতেন। এই প্রশিক্ষণ শেষে এখন তিনি তার এলাকার ২০০টি পরিবারের প্রায় ৯০০ জন মানুষের মাঝে প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সচেতন করে তুলেছেন।

খোলা পায়খানা অপসারণ করে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরির গল্প: অভাব-অনটনের সংসারে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস কি সেটা জানতেন না আর গ্রামের নারী হিসেবে স্বামী যেভাবে রাখতেন সেভাবেই থাকতেন। তাদের পায়খানা বলতে বাড়ির পাশে পুকুরের কিনারায় গর্ত করা এবং পুরনো শাড়ি দিয়ে বেড়া দেওয়া এবং মল সরাসরি পুকুরে চলে যেত, এছাড়া যথেষ্ট পানি ব্যবহারেরও ব্যবস্থা থাকতো না বা পায়খানার পর সাবান পানি দিয়ে হাত ধুতে হয় জানলেও ব্যবস্থা ছিল না। বর্ষা মৌসুমে পুকুরের পানি ভর্তি হয়ে পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়তো ফলে বর্ষা মৌসুমে রোগবালাই বেশি হতো। এছাড়া বাড়ির কিশোরী মেয়ে ও নারী সদস্যরা মাসিকের সময় অনেক সমস্যায় পড়তেন কিন্তু তার পরিবারের মানুষজন এ বিষয়টাতে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। বুরো বাংলাদেশের 'মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি' প্রকল্পের প্রশিক্ষণ চলাকালীন স্বাস্থ্যকর পায়খানা নিয়ে সেশন নেওয়ার সময় অস্বাস্থ্যকর বা খোলা পায়খানা ব্যবহারের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরেন তখন তিনি বাড়িতে এসে তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন এবং পাকা পায়খানা তৈরির পরিকল্পনা করেন। ঘরে থাকা কিছু সঞ্চয় এবং বুরো বাংলাদেশের সমিতিতে জমানো সঞ্চয়ের টাকা উত্তোলন করে পাকা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করেন। এই পায়খানা তৈরির ফলে তার কিশোরী মেয়ে খুব খুশি।

বুরো বাংলাদেশের 'মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি' প্রকল্পের একজন কো-হেলথ এডুকেটর হিসেবে তিনি কি কাজ করেন তা তার পরিবার ও সমাজের মানুষ বুঝতে পেরেছেন যার ফলে পরিবারের সকলের কাছে তিনি আস্থা ও বিশ্বাসের পাত্রী হয়েছেন এবং পারিবারিক বিভিন্ন কাজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখন তার মতামত নেওয়া হয় এতে তিনি মনে করেন একজন নারী হিসেবে তার পারিবারিক সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি সপ্তাহে ২০০টি পরিবারের কাছে স্বাস্থ্য শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করতে গিয়ে সকলের সম্মান ও ভালোবাসা পাচ্ছেন এবং এলাকায় তার আলাদা পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তিনি রান্না করার সময় দেখেন পরিবারের সকলের জন্য সুষম খাবার নিশ্চিত হচ্ছে কি না, ঘরের ও আঙ্গিনার ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা হচ্ছে কি না তার কিশোরী মেয়েকে কিশোরীকালীন স্বাস্থ্য নিয়ে সাহস ও সচেতন করেন ফলে তাদের পরিবারের সকলের মাঝে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে উঠেছে।

বুরো বাংলাদেশের 'মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি' প্রকল্পের প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন এবং প্রকল্প এর সাথে যুক্ত হতে পেরে তিনি সকলের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ।■

● হেলথ ট্রেইনার, মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি
বুরো বাংলাদেশ

মাতৃবন্ধু এএইচএম নোমান

সম্প্রতি এনজিও সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ডরপ্ এর প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্ষীয়ান উন্নয়ন চিন্তাবিদ এএইচএম নোমান এর চিন্তা চেতনা ও কর্মধারাকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ‘মাতৃবন্ধু এএইচএম নোমান’। বইটির লেখক হাসানুল কাদির এবং বইটি সম্পাদনা করেছেন সম্পাদক শাওয়াল খান।

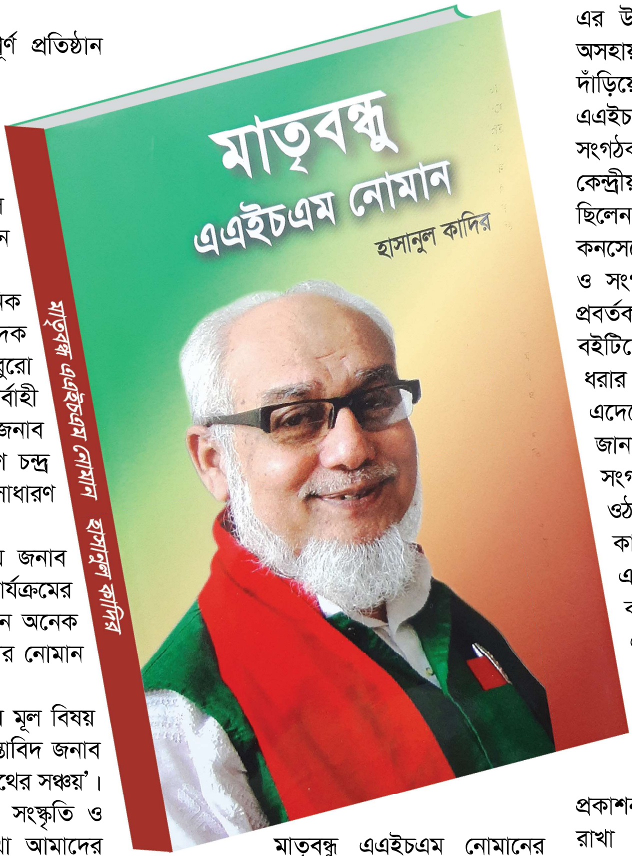

বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন দৈনিক ইত্তেফাক ও পাক্ষিক অনন্যার সম্পাদক জনাব তাসমিমা হোসেন, বুরো বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, এফএনবির চেয়ার জনাব জাকির হোসেন এবং আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন, রিসার্চ সোসাইটি কলকাতার সাধারণ সম্পাদিকা দেবকন্যা সেন।

জনাব জাকির হোসেন তার লেখায় জনাব এএইচএম নোমানের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেও ‘প্রচারহীন বীর নোমান ভাই’।

সম্পাদক উল্লেখ করেছেন এ বইটির মূল বিষয় হচ্ছে একজন কীর্তিমান বর্ষীয়ান চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাসান মোহাম্মদ নোমানের ‘পথের সঞ্চয়’। এতে স্থান পেয়েছে সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের নানা গল্প। এসব গল্পকথা আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশ।

মাতৃবন্ধু এএইচএম নোমানের দীর্ঘ পাঁচ দশকের কর্মসাধনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ২০০৫ সালে ১০০ দরিদ্র মায়ের জন্য পরীক্ষামূলক মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রবর্তন। যা থেকে আজ প্রাতিষ্ঠানিক কাজে যুক্ত নেই এমন হতদরিদ্র মেহনতি মায়েরাও মাতৃত্বকালীন ভাতা পাওয়ার অধিকার অর্জন করেছেন। এ বই থেকে জানা যায়, এএইচএম নোমান ছাত্রজীবন থেকেই সমাজ ও দেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। ৭০ এর উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী অসহায় মানুষের পাশে ত্রাণ সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

এএইচএম নোমান একজন সেবক, একজন দক্ষ সংগঠক। তিনি ১৯৭০-৭১ সালে রামগতি থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গুচ্ছগ্রাম কনসেপ্টে বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সংগঠক তিনি। গ্রাম সরকার এর অন্যতম প্রবর্তক ও সংগঠক।

বইটিতে এএইচএম নোমানকে পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে যা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। এদেশে শুধু রাজনীতিবিদদের সম্পর্কেই মানুষ জানার সুযোগ পায়– সেখানে একজন উন্নয়ন সংগঠক এএইচএম নোমান এর ‘মাতৃবন্ধু’ হয়ে ওঠার বাস্তব কাহিনিসহ অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিষয়গুলো চমৎকারভাবে উঠে এসেছে এই বইয়ে। বইটির ফটো অ্যালবামে কর্মজীবনের মূল্যবান অনেক ছবি রয়েছে। এদেশে আরো যারা মানব উন্নয়নে বেসরকারিভাবে কাজ করছেন তাদের ওপরও এ ধরনের প্রকাশনা হওয়া উচিত, মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

বইটি প্রকাশ করেছে ‘প্রতিবুদ্ধিজীবী’ প্রকাশন। মোট ৫৩৬ পৃষ্ঠার এই বইটির মূল্য রাখা হয়েছে ১০০০ টাকা। আমরা বইটির পাঠকপ্রিয়তা প্রত্যাশা করি।■

অন্য এক অনুভূতি

‘অন্য এক অনুভূতি’ গ্রন্থটি একেবারেই ভিন্ন মেজাজের, ভিন্ন আঙ্গিকের। মানুষের যাপিত জীবনের ঘটে চলা টুকরো টুকরো কাহিনি, অনুভূতি এবং মূল্যায়নধর্মী কথাবার্তা দিয়ে বইটি সাজানো হয়েছে। এতে রয়েছে অসংখ্য চিন্তাবিদ ও দার্শনিকের মূল্যায়ন বক্তব্য এবং ঘটনার কথা। ড. ইউসুফ খান প্রথাগত লেখক না হলেও তিনি দীর্ঘদিন থেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখে চলেছেন। বৈদেশিক মুদ্রা, দেশের অর্থনীতি, প্রবাসী রেমিট্যান্স, অভিবাসী বিষয়ক তার বিভিন্ন লেখা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে তা বই আকারে প্রকাশ পেয়েছে। তবে ‘অন্য এক অনুভূতি’ বইটি লেখকের মনোজগৎ এবং চিন্তাভাবনার ফসল। এ বইতে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে এনে পাঠকের মনোজগৎকেও নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন ‘একটি সত্যিকারের ভালোবাসার গল্প বিষয়ক’ প্রবন্ধ নিবন্ধ যাই বলি না কেন তিনি লিখেছেন ‘এ পৃথিবীতে ঘৃণা শুধু ঘৃণাই বাড়ায়। ঘৃণা দিয়ে কোনো কিছু জয় করা যায় না। কিন্তু ভালোবাসা দিয়ে জয় করা যায়। একটি ভালোবাসাময় শব্দ অনেক কিছু বদলে দিতে পারে।’

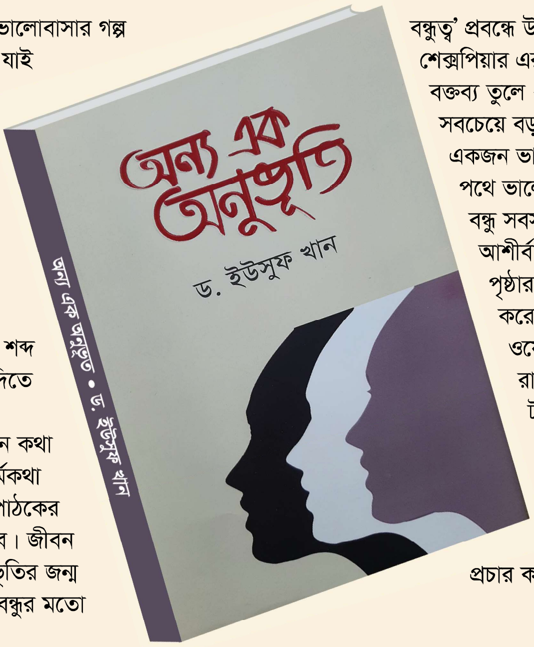

এ রকম প্রচুর মূল্যবান কথা এবং চির সুন্দরের মর্মকথা বইটিতে রয়েছে যা পাঠকের বোধকে জাগ্রত করবে। জীবন সম্পর্কে অনেক অনুভূতির জন্ম দেবে। যেমন তিনি ‘বন্ধুর মতো বন্ধুত্ব’ প্রবন্ধে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এর উপলব্ধিময় বক্তব্য তুলে ধরেছেন–‘জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার হচ্ছে একজন ভালো বন্ধু। চলার পথে ভালো বন্ধু বা প্রকৃত বন্ধু সবসময়ই আশীর্বাদস্বরূপ। ১২৮ পৃষ্ঠার এই বইটি প্রকাশ করেছে স্টুডেন্ট ওয়েজ। বইটির মূল্য রাখা হয়েছে ৩০০ টাকা। ছাপা, কাগজ ও বাইন্ডিং বেশ ভালো হয়েছে। বইটির বহুল প্রচার কাম্য।■

ফেরদৌস সালাম

কুমিল্লায় বুরো বাংলাদেশ এর CHRD

লালমাই পাহাড়-ময়মনামতি বৌদ্ধবিহার খ্যাত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কুমিল্লায় বুরো বাংলাদেশ এর এক অসাধারণ নান্দনিক স্থাপনা বুরো বাংলাদেশের CHRD। কুমিল্লা শহরস্থ কোটবাড়ি বিশ্বরোডের পাশে ধনপুরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এই আলোকিত ভবন। সুদৃশ্য এই ভবনটির সামনে রয়েছে ওয়াটার বডি– যা সকালের রোদের ছায়ায় একরূপ, দুপুরে অন্যরূপ এবং বিকেলের রোদে হয়ে ওঠে আরো মোহনীয়। দশ তলা ভবনের রুমের জানালায়/বারান্দায় অথবা নিচে বসে উপভোগ করার মতো। ওয়াটার বডির সাথে রাউন্ড টেবিল ও চেয়ার রয়েছে। পেছনের দিকে রয়েছে বাধানো সুন্দর পুকুর, সেখানে বসার সুব্যবস্থা আছে।

এই ভবনে থাকার জন্য ১টি ফ্যামিলি স্যুট রুমসহ ৩টি স্যুট রুম, ১৬টি এক্সিকিউটিভ কিং (AC Couple Bed), ৫১টি এক্সিকিউটিভ টুইন (AC 2 Bed) রয়েছে। সিএইচআরডির আবাসিক কক্ষসমূহের ধরন অনুসারে বেশ কিছু কমপ্লিমেন্টারি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেমন- সকালের নাস্তা, ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা, ব্যায়ামাগার সুবিধা, শাওনা বাথ ও স্টিম বাথ, বিশুদ্ধ খাবার পানি (জনপ্রতি ৫০০ মি.লি., প্রতিদিন ২টি), গাড়ি পার্কিং এমিনিটিজ।

২টি প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রতিটিতে ৩০ জন করে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আধুনিক উপকরণ রয়েছে। দ্বিতীয় তলার কনফারেন্স রুম-১ এ ১০০ জন এবং কনফারেন্স রুম-২ (নিচ তলায়) এ ১২০-১৩০ জনের বসার সুবিধা রাখা হয়েছে। কনফারেন্স রুম দুটোতে পর্যাপ্ত আলো, স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মত আধুনিক ব্যবস্থাদি রয়েছে।

৫ম তলায় জিম রুমের সামনে মনোরম পরিবেশে বারবিকিউ এবং ১০ম তলায় আউটডোর ডাইনিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। এখানেও বারবিকিউ করার সুবিধা রয়েছে। অতিথিদের চাহিদামতো খাবার পরিবেশন করা হয়।

কুমিল্লা সিএইচআরডিতে এলেই যেকোনো সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষের মধ্যে অধিক সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হবে– এটি নিশ্চিত করে বলা যায়। এর প্রতিটি ফ্লোরই শিল্পসম্মতভাবে সাজানো। কুমিল্লা এলে বুরো বাংলাদেশ এর সেবা গ্রহণের মাধ্যমে যে কোনো পর্যটক করতে পারেন নিরাপদ ভ্রমণ। অন্যদিকে মানসম্মত অফিসিয়াল প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্সের জন্যও বুরো বাংলাদেশের এই সিএইচআরটি একান্ত অপরিহার্য। কারণ, যেকোনো প্রশিক্ষণার্থীই এখানে প্রশিক্ষণ নেয়া গৌরবান্বিত মনে করবেন তাতে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতিজড়িত ও হাজার হাজার সভ্যতা বহনকারী কুমিল্লার প্রাণকেন্দ্রে মনোরম পরিবেশে স্থাপিত এই সিএইচআরডিটি রাতে আরো ঝলমল করে ওঠে।

উল্লেখ্য, দারিদ্র্যবিমোচন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের নানাবিধ কার্যক্রমের পাশাপাশি বুরো বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ের পর্যটকদের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোকে (CHRD) সাজিয়েছে যা প্রশংসার দাবি রাখে।

আবাসনের জন্য ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে স্যুট রুম (৮০০১) = ১৩,৫০০ টাকা, স্যুট রুম (৮০০২, ৮০০৪) = ১২,০০০ টাকা ফ্যামিলি স্যুট রুম (৮০০৬) = ১৩,০০০ টাকা এক্সিকিউটিভ কিং ৭,৫০০ টাকা, এক্সিকিউটিভ টুইন = ৭,৫০০ টাকা। প্রশিক্ষণ কক্ষ প্রতিটি ১৩,৫০০ টাকা, কনফারেন্স রুম প্রতিটি ২০,০০০ টাকা এবং অডিটরিয়াম ৩৬,০০০ টাকা। প্রতিটি কক্ষের জন্য ১০% সার্ভিস চার্জ এবং ১৫% ভ্যাট ধরা হয়েছে।

CHRD Cumilla
Coatbari Road, Dhanpur,
Halimanagar, Cumilla
Mobile : 01701250116,
E-mail: chrdcumilla@burobd.org

মুজিব জন্মশতবর্ষে বুরো বাংলাদেশের ‘বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি’

মুজিব জন্মশতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ‘বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি’ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বুরো বাংলাদেশ। এই কর্মসূচির আওতায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ৮জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা শুরু করেছে বুরো বাংলাদেশ। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের উচ্চ শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে ৬ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন। বৃত্তির এই অর্থ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রেরণ করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন:

১. মোসাম্মৎ উম্মাতুন নেসা, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, ২. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর ৩. শরিফুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪. মো. আল-আমিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫. মিঠুন চন্দ্র রায়, ঢাকা প্রোকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ৬. মো. ফয়সাল আকন্দ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ৭. স্নিগ্ধা আজভীন সখি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৮. মো. রুবেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজের MBBS শিক্ষার্থী মোসাম্মৎ উম্মাতুন নেসার হাতে বৃত্তির চিঠি ও মাসিক ৬ হাজার টাকার চেক তুলে দেন বুরো বাংলাদেশের পাবনা বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান রিপন ও রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান।

দিনাজপুরের হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কমিউনিকেশনের ছাত্র মো. মোস্তাফিজুর রহমান এর হাতে বৃত্তির সনদ তুলে দেন বুরো বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক আব্দুস ছালাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র শরিফুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের ছাত্র মো. আল আমিন, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (গাজীপুর) এর তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র মিঠুন চন্দ্র রায় এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ এর এমবিবিএস এর ছাত্র মো. ফয়সাল আকন্দ'র হাতে শিক্ষা বৃত্তির সনদ ও চেক তুলে দেন বুরো বাংলাদেশের কর্মসূচি বিভাগের সমন্বয়কারী মুখলেছুর রহমান লিটন, ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক শাহীনুর ইসলাম খান এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচার এর ছাত্রী স্নিগ্ধা আজভীন সখি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র মো. রুবেলকে শিক্ষাবৃত্তির সনদ ও চেক প্রদান করেন বুরো বাংলাদেশের টাঙ্গাইল বিভাগের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক হারুন-অর-রশিদ এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো. আরিচ হোসেন।

বুরো বাংলাদেশের ২৮তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ এপ্রিল ২০২২ বুরো বাংলাদেশের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা গুলশানের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গভর্নিং বডির সম্মানিত চেয়ারপার্সন আলতাফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারপার্সন ডা. সাঈদা খান ও অর্থ সচিব ড. এম এ ইউসুফ খানসহ সাধারণ সভার সকল সদস্য অংশগ্রহণ করেন। বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন এবং বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর সদস্যবৃন্দও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বুরো বাংলাদেশ ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রতিষ্ঠান উপায় এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

বুরো বাংলাদেশ ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার প্রতিষ্ঠান উপায় এর সাথে ২৯ এপ্রিল এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিপত্রে বুরো বাংলাদেশের পক্ষে পরিচালক– অপারেশনস, ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এইচআরডি এবং আইসিটি ফারমিনা হোসেন এবং উপায় এর পক্ষে চিফ সেলস অ্যান্ড সার্ভিস অফিসার ইমন কল্যাণ দত্ত স্বাক্ষর করেন।

বুরো বাংলাদেশের প্রায় ২৫ লাখ গ্রাহক ও সদস্যরা যাতে তাদের নিজস্ব পছন্দের সার্ভিস প্রোভাইডার এর মাধ্যমে ঋণ ও সঞ্চয়ের টাকা ডিজিটাল প্লাটফর্মে লেনদেন করতে পারে সে লক্ষ্যেই এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বুরো বাংলাদেশের পরিচালক– অর্থ এম. মোশাররফ হোসেন এবং উপায় এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও রেজাউল হোসেইন। অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন নির্বাহীরা উপস্থিত ছিলেন।

৪র্থ বারের মতো বুরো বাংলাদেশ এর জাতীয় ট্যাক্স কার্ড ও সম্মাননাপত্র গ্রহণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ২০২১ সালের অন্যান্য ক্যাটাগরিতে '১ম সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী' নির্বাচিত হয়েছে বুরো বাংলাদেশ। গত ২৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকা অফিসার্স ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বুরো বাংলাদেশের পক্ষে 'জাতীয় ট্যাক্স কার্ড ও সম্মাননাপত্র' গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক– অর্থ এম. মোশাররফ হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই এর সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম, সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। উল্লেখ্য, বুরো বাংলাদেশ ৪র্থ বারের মতো এই সম্মাননা অর্জন করলো।

বুরো বাংলাদেশের মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি

অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন

১ জুলাই ২০১৯ থেকে উন্নয়ন সহযোগী Opportunity International Australia ও Australian Aid এর সহযোগিতায় প্রান্তিক, অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৭ মে ২০২২ তারিখ অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন, ঢাকা থেকে সেকেন্ড সেক্রেটারি Mr. Duncan McCullough-এর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল মধুপুর ও সখিপুর অঞ্চলে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শক দল প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠী, কো-হেলথ এডুকেটর, ফিল্ড হেলথ মোটিভেটর, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সেন্টারের কর্মী, প্রকল্প কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কর্মসূচি বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মীদের সাথে মতবিনিময় এবং কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনসহ আগত রোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাদান প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন।

এছাড়াও মধুপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সাথে তাদের কার্যালয়ে প্রকল্প কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভিন্ন দফতরের সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতার বিষয়ে মতবিনিময় করেন। উক্ত টিম মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়ন পন্থা, লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সাথে সংস্থার কর্ম সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের প্রকল্প কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা পর্যবেক্ষণ করে সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন।

পরিদর্শন টিমে অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি Mr. Duncan McCullough ছাড়াও ইমাম নাহিল, প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং নিটোল দেওয়ান, প্রোগ্রাম অফিসার উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার পক্ষ থেকে এসএমএ রকিব, সহকারী সমন্বয়কারী বিশেষ কর্মসূচি, হারুন অর রশীদ, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, টাঙ্গাইলসহ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, এলাকা ব্যবস্থাপক, শাখা ব্যবস্থাপক এবং প্রকল্প কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালকের সাথে ব্র্যাক ব্যাংক প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

২৭ এপ্রিল ২০২২ ব্র্যাক ব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রতিনিধি দলটি দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন এবং নির্বাহী পরিচালককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন তাপস কুমার রায়, হেড অব এমএফআই এন্ড এগ্রিকালচার ফাইন্যান্স; উম্মে হাবিবা, এ্যাসোসিয়েট রিলেশনশিপ ম্যানেজার এবং মিতালি সাহা, এ্যাসোসিয়েট রিলেশনশিপ ম্যানেজার।

বুরো বাংলাদেশকে ইস্টার্ন ব্যাংক কর্তৃক ক্রেস্ট প্রদান

গত ৭ এপ্রিল বুরো বাংলাদেশের পরিচালক অর্থ এম মোশাররফ হোসেনের হাতে ইস্টার্ন ব্যাংক লি. এর একটি প্রতিনিধি দল 'বেস্ট পার্টনারশিপ ক্রেস্ট' হস্তান্তর করেন। ইস্টার্ন ব্যাংক এর প্রতিনিধি দলে ছিলেন মো. ওবায়দুল ইসলাম, হেড অব কর্পোরেট ব্যাংকিং রিলেশনশিপ ইউনিট এবং জাকিয়া জলিল, সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার। আরো উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের অর্থ ও হিসাব বিভাগের তৎকালীন সমন্বয়কারী আব্দুল হালিম।

বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান সম্প্রতি বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে একটি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। সাথে ছিলেন কর্পোরেট বিজনেস ইউনিট প্রধান আশরাফ-উর-রহমান চৌধুরী এবং সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার জোবায়ের রাজা। নেদারল্যান্ড ভিত্তিক অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান এফএমও-এর সাথে ত্রিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বুরো বাংলাদেশের পরিচালক অর্থ এম মোশাররফ হোসেন এবং পরিচালক অপারেশনস ফারমিনা হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

দীপ্ত ফাউন্ডেশনকে বুরো বাংলাদেশের আর্থিক অনুদান

নারীর অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে নিয়োজিত সংস্থা দীপ্ত ফাউন্ডেশনকে ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে বুরো বাংলাদেশ। বুরো বাংলাদেশের প্রশাসন বিভাগের সমন্বয়কারী মো. এরশাদ আলম গত ২৪ জানুয়ারি ২০২২ দীপ্ত ফাউন্ডেশন এর মিরপুরস্থ কার্যালয়ে সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী জাকিয়া হাসান মলির হাতে এই চেক তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের প্রশাসন বিভাগের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক ও প্রত্যয়ের নির্বাহী সম্পাদক বিদ্যুত খোশনবীশ এবং দীপ্ত ফাউন্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। নারীদের জন্য স্বল্প মূল্যের স্যানিটারি ন্যাপকিন উৎপাদনে অনুদানের এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

বাহারুল ইসলাম একজন পুরাদস্তুর সবজি চাষী। থাকেন চাপাইনবাবগঞ্জের নাচোল থানার ইসলামপুর গ্রামে। এটাই তার উপার্জনের একমাত্র ও নির্ভরযোগ্য উৎস। বাজার চাহিদার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে পুরোপুরি মনোযোগ দিয়েছেন বেগুন ও টমেটো চাষে। এই দুই সবজি বিক্রি করে এক মৌসুমে যা আয় হয় তা নেহায়েত কম নয়। ছয় সদস্যের পরিবারে স্বচ্ছলতা এসছে এই বেগুন আর টমেটো বিক্রি করেই। তবে এটুকুর মধ্যেই আটকে থাকতে চান না বাহারুল। সামনের মৌসুমগুলোতে ধাপে ধাপে বাড়াতে চান তার আবাদের পরিসীমা। চাষ করতে চান মটর, মসুর ও খেসারী। বুরো বাংলাদেশের সাথে তিনি সম্পৃক্ত হয়েছেন দুই বছর হলো। বুরো'র ঋণ সহায়তায় তিনি বাস্তবায়ন করতে চান তার পরিকল্পনা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চান প্রিয় স্বদেশ।

আলোকচিত্র ● বিদ্যুত খোশনবীশ

জানুয়ারি-মার্চ ২০২২ • সংখ্যা-২৮ • বর্ষ-৭

বুরো বাংলাদেশ

নারীর অগ্রযাত্রা

আনবে সমৃদ্ধি

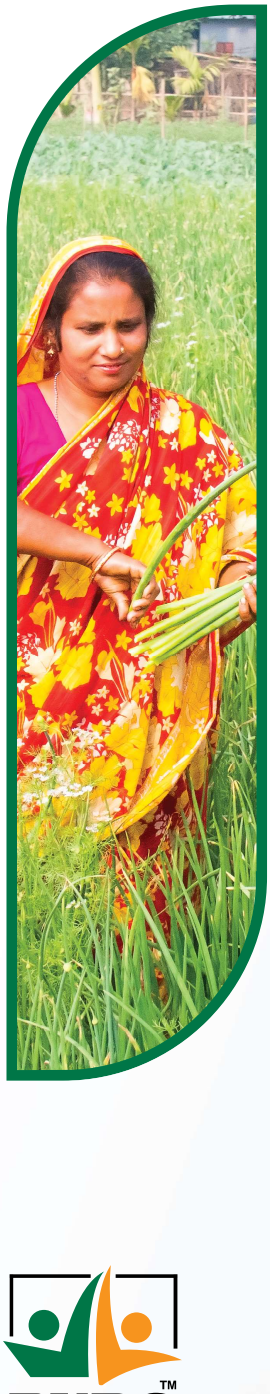

BURO™ Bangladesh

#MICROFINANCE_TO_MACROHAPPINESS